জুলাই ১৯৮৮

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রাশি

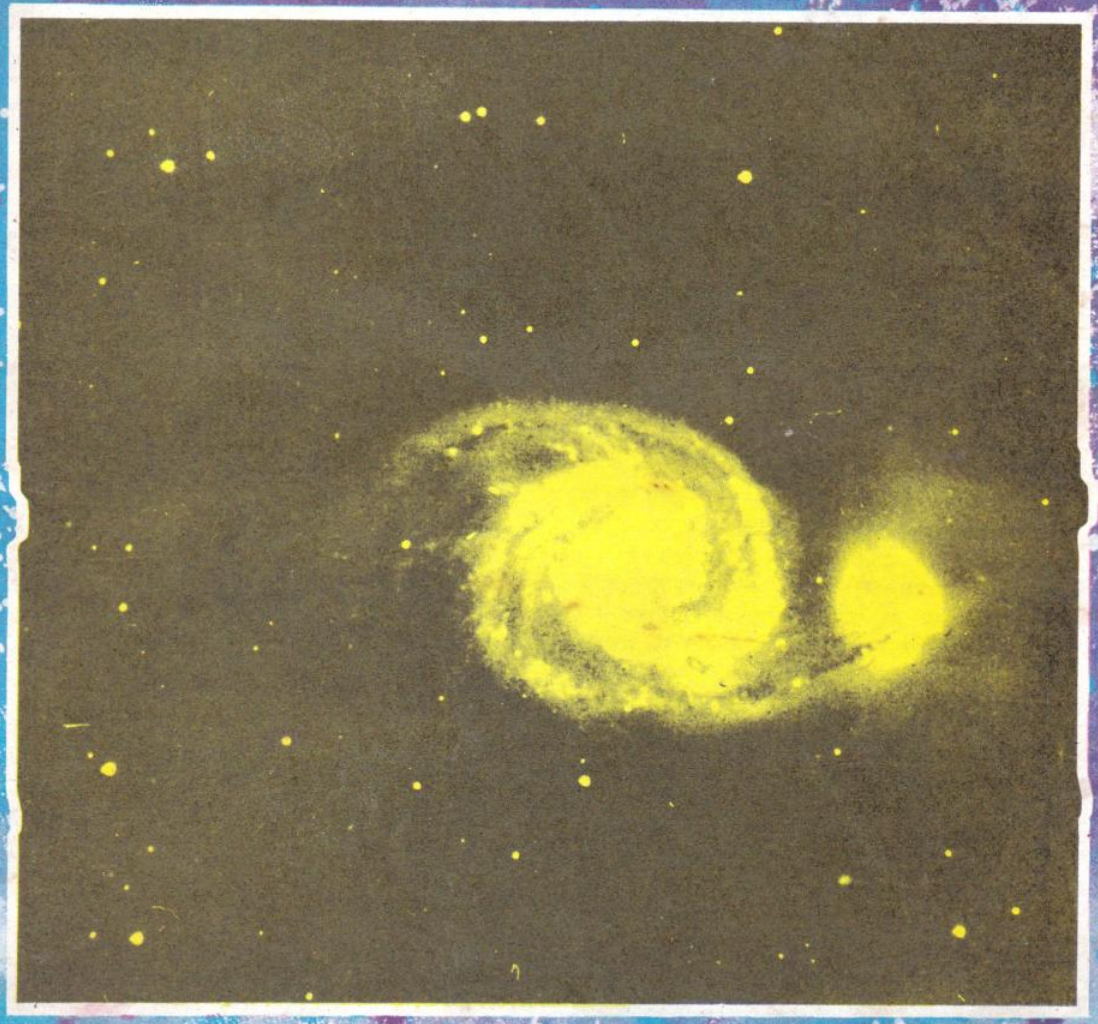

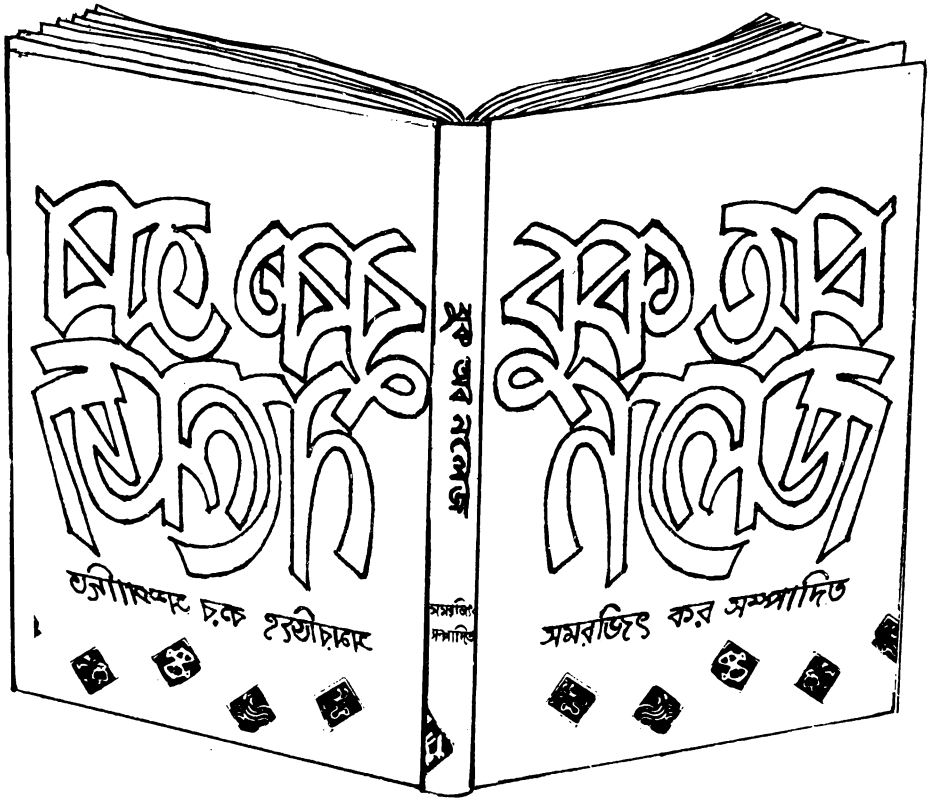

দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

'অণু' শব্দের অর্থ কি ? পরমাণুই বা কাকে বলে ? আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের অজানা নয়। কিন্তু অক্টেন স শব্দটির অর্থ আমরা সবাই জানি কি ? ভিনিগার নানারকম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহার হয়। কিন্তু ভিনিগার যে একরকমের অ্যাসিড এ তথ্য আমাদের অনেকেরই অজানা। ম্যাগ্রোমিটার ও ম্যানোমিটার শব্দদুটি আজকাল আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। কিন্তু শব্দদুটির সঠিক ব্যবহার কি ? বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও অনেক শব্দ আমরা শুনতে পাই—যার প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানি না। এইরকম প্রায় ২৫০০ শব্দের চিত্রসহ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রচনা করেছেন প্রবীণ বিজ্ঞান লেখক অমরনাথ রায়। যে গ্রন্থ শুধু কিশোর কিশোরীদেরই নয়, অনেক বয়স্ক পাঠকেরও কৌতূহল মেটাবে। পঁচিশ টাকা

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
অমরনাথ রায় সঙ্কলিত

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

আপনার ছেলেমেয়েদের
আরও জানার কৌতূহল
মেটাবে

একখণ্ডে সম্পূর্ণ

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস

পঞ্চাশ টাকা

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
জুলাই : 1988

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সাপ ও সাপের বিষ

প্রধান সম্পাদক : **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক : **রবীন বল**
সহ সম্পাদক : **জয়ন্ত দত্ত**

সূচীপত্র

চিঠিপত্র : 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর : মহাকাশ গবেষণায় ভারত ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প : পথ ॥ সঙ্কর্ষণ রায় 35 : সূর্যদাদুর চকমকি ॥ বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় 48

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : আকাশের নতুন জ্যোতিষ্করাশি ॥ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 19

পড়াশোনা : ফ্লোরিণ ॥ অমরনাথ রায় 15 : সংখ্যার ধাঁধা শঙ্কার নয় ॥ প্রভাত কুমার দত্ত 53 : ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর · অয়ন ও সৌমেন মজুমদার 42

শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা : ডায়াবেটিস ॥ দেবব্রত রায় 30

জানা-অজানা : বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী 66

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা : জ্ঞান বিজ্ঞানের বই 18 : দুমুখো নীতি ॥ কপিঞ্জল শর্মা 54 : বিজ্ঞানের খবর ॥ জয়ন্ত মণ্ডল 10 : নাক ডাকলে কি করণীয় ॥ কমল চক্রবর্তী 28 : ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 27

কমপিউটারের কলাকৌশল : বাইনারি পদ্ধতি ॥ সৌম্য মিত্র 16

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : অ্যানড্রিয়ান ভেসালিয়াস ॥ শঙ্কর ঘটক 51 : আচার্য আর্যভট্ট ॥ কৌশিক ভট্টাচার্য 39 : প্যাপিরাস ছেড়ে পার্চমেণ্ট ॥ কার্তিক ঘোষ 40

ধারাবাহিক রচনা : নীল সাগরে রহস্য ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 31
ছড়া : গুণের ঘাটী ॥ মিলন কুমার মুখার্জী 37

খেলাধুলা : খেলাধুলার টুকিটাকি ॥ অজয় দাশগুপ্ত 41

ফিচার ও ছবিতে গল্প : আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ অনিল কর্মকার ও গৌতম কর্মকার 12 : কীট পতঙ্গের কথা ॥ অলয় ঘোষাল 14, 58 : প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 55 : ক্যুইজ কনটেস্ট, 56 : ক্যুইজ কনটেস্ট ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার সমাধান 57 : খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 : যুগের ভিতর যুগ ॥ অনিল কর্মকার ও গৌতম কর্মকার 43

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : সফল উত্তরদাতাদের নাম 63 : শব্দকূট 57 : বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 59 : পায়ে পায়ে চটপটি ॥ অপরাজিত বসু 61 : শব্দকূটের নিয়মাবলী 62 : বিজ্ঞান সংবাদ 62 : রিচার্জেব্‌ল্ টর্চ ॥ সৌগত দত্ত ও অরিন্দম রক্ষিত 65

প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল ॥ **অন্যান্য ছবি :** অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল

চিঠিপত্র

আত্মা, জন্মান্তর পরলোক

মে 88 সংখ্যা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে 'বলতে পারো কেন?' বিভাগে প্ল্যানচেট বা প্রেত বৈঠক সমন্ধে শ্রী সুধাংশু পাত্র যা বলেছেন তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সুতরাং এ-বিষয়ে বিজ্ঞান পত্রিকার মতামত খুব স্পষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু সুধাংশুবাবুর বক্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেই।

শাস্ত্র মতে আত্মা হল মন। আধুনিক বিজ্ঞান বলে মন হল মস্তিষ্কের কোষগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফল। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে শুরু করে সেই কোষগুলি। আর মৃতকোষ যেহেতু পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রাখতে পারে না তাই মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই লোপ পায় মনের অস্তিত্ব। তাহলে, মন বা আত্মাই যেখানে রইল না, সেখানে প্ল্যানচেট টেব্‌ল টার্নিং প্রভৃতি আত্মা আহ্বানের পদ্ধতিগুলিই কি অর্থহীন হয়ে যায় না?

হিন্দুশাস্ত্র পরলোক ও জন্মান্তর সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব পরিবেশন করে তা যেমন হাস্যকর তেমনই অসার। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গরুড়পুরাণে বলা হয়েছে যেখানে সেখানে ভোজনকারী ব্যক্তি মার্জার হয়ে পরজন্ম গ্রহণ করে। একথা যদি সত্যি হয় তবে তো আগামী যুগে পৃথিবীতে আর একটিও মানুষ থাকবে না; দাপটে রাজত্ব করবে বেড়ালরা। কারণ বাড়ির বাইরে সামান্য কিছুও দাঁতে কাটেন নি এমন ব্যক্তি বোধহয় বর্তমানকালে বিরল।

সংক্ষেপে দু'টি ঘটনা তুলে ধরছি।

মাতৃবিয়োগের পর শার্লক হোমসের স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েল খুব ভেঙে পড়েছিলেন। সবসময় মা'র সান্নিধ্য লাভের উপায় খুঁজতেন। তাঁর এই দুর্বলতাকে মূলধন করে দুই মার্কিনী মিডিয়াম ডয়েলের সামনে হাজির করল তাঁর মৃতা জননীকে। ডয়েল খুশিতে আত্মহারা হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলেন। এর ক'দিন বাদে পুলিশ দুই মিডিয়ামের ডেরায় হানা দিয়ে প্রেতমূর্তি গঠনের উপযোগী প্রচুর শিফন কাপড়, পরচুলা মুখোশ প্রভৃতি আটক করে। হয়তো তার মধ্যে ডয়েল-জননীর ছায়াশরীরের দেহাবশেষও ছিল।

জলদস্যুনেতা জন কিং এর কন্যা কেটি কিং এর প্রেতাত্মা ওয়াকিবহাল মহলে সুপরিচিত। পদার্থবিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুকস এর সঙ্গে সেই প্রেতাত্মার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন মিডিয়াম ফ্লোরেন্স কুক। কেটির সঙ্গে ক্রুকস একসঙ্গে ছবিও তোলেন। বিশ্বাসীরা বাদে আজ সকলেই সন্দেহাতীতভাবে মেনে নিয়েছেন যে, ফটোর কেটি কিং আসলে মিডিয়াম ফ্লোরি কুক স্বয়ং। অর্থাৎ পদার্থবিদ প্রতারিত হয়েছিলেন।

সুধাংশুবাবু এসব তথ্য তুলে দিলে তাঁর কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের মঙ্গলই করতেন। কিন্তু তিনি ভাসাভাসা অস্পষ্ট কিছু যুক্তি দেখিয়ে সবকিছু ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকের বিবেচনার ওপর—একজন বিজ্ঞান-লেখকের কাছ থেকে এমনটি কাম্য নয় কোনোমতেই। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়ার অর্থ মনুষ্যত্বের অবমাননা, তাই সুধাংশুবাবু "বিজ্ঞানের কাছে আজও আত্মা, জন্মান্তর, পরলোক ইত্যাদি অন্ধকারে ঢাকা থেকে গেছে" এরূপ মন্তব্যটি করে ঠিক করেন নি।

কাজল ভট্টাচার্য দমদম রোড কলকাতা-2

প্রসঙ্গ : ডাইনোসর

গত এপ্রিল' 88 সংখ্যায় 'ডাইনোসর রচনায় লেখা ছিল যে (i) দীর্ঘতম ডাইনোসর হল ডিপ্লোডকাস (Diplodocus যার, পাঁচিশ মিটার লম্বা লেজ যা পুরো শরীরের অর্ধেক।

এই উত্তরটি সম্পূর্ণ ভুল। আসলে উদ্ভিদ্‌ভোজী ডাইনোসর ডিপ্লোডকাস এর দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় 27 মিটার (90 ft) এবং যার ওজন প্রায় 80 টন।

এই ডিপ্লোডকাস ডাইনোসর-এর কঙ্কাল লণ্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব সায়েন্স মিউজিয়মে রাখা আছে।

এ সম্পর্কে আর একটি কথা আমাদের জানা ভাল, তা হল সবচেয়ে বড় প্রাণীভোজী ডাইনোসর হল টাইরানোসরাস (Tyrannosarus) (যারা ক্রিটাসিয়াস যুগে বাস করত)। এদের দৈর্ঘ্য প্রায় 25 মিটার এবং ওজন প্রায় 50 টন।

(ii) এবং উক্ত রচনায় ছিল ব্রাকিওসরাস (Brachiosarus) ছিল সবচেয়ে ওজনদার, সত্তর থেকে আশি টন। এটি একটি ভুল তথ্য। কারণ সবচেয়ে ওজনদার ডাইনোসর-এর নাম ডিপ্লোডকাস (যারা জুরাসিক যুগে বাস করত)। যাদের ওজন 80 টন।

(iii) এছাড়া দেওয়া ছিল ব্রায়োসরাস নামক ডাইনোসর হল বিশাল দেহী প্রায় 25 মিটার লম্বা ওজন তিনশ টনের কাছাকাছি। এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সবচেয়ে ওজনদার ডাইনোসর এর ওজন 80 টন।

কি করে একটি ডাইনোসর-এর ওজন 300 টন হয় তা বিস্ময়ের ব্যাপার!

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ জয়রামপুর (এস. টি রোড) পোঃ-শুকদেবপুর জেলা-24 পরগনা।

পরমাণু ঃ প্রশ্নোত্তর

গত মে 1988 সংখ্যার পরমাণু ঃ কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর পড়ে কিছু উত্তর সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে লেখকের একবার উল্লেখ করা দরকার ছিল পরমাণুরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু অণুরা তা পারে না। দ্বিতীয় উত্তরে লেখক বলেছেন অণুরা স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে একটু বলে দিলে ভাল হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ক্ষেত্র ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই পরমাণু স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে না। অণু পরমাণুর পার্থক্যের মধ্যে আরও বলা উচিৎ ছিল—(1) যেহেতু একটি পরমাণুর মধ্যে অন্য কিছু থাকে না, যেহেতু উহার ধর্ম সর্বদাই নির্দিষ্ট প্রতিটি অণুর ধর্মও নির্দিষ্ট কিছু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরমাণু কণা দ্বারা গঠিত বলে অণুর ধর্ম উহার উপাদান—কণাগুলির ধর্ম হইতে পৃথক (ii) পরমাণু বলতে একটা ভিন্ন কণাকে বুঝায়। উহার মধ্যে সম বা ভিন্ন শ্রেণীর অন্য কিছু থাকে না। অণু বলতেও একটি নির্দিষ্ট কণাকে বুঝায় কিন্তু উহার মধ্যে সম বা ভিন্ন শ্রেণীর দুই বা ততোধিক পরমাণু কণা থাকে।

7নং প্রশ্নের উত্তরে সাদৃশ্যের মধ্যে লেখা হয়েছে উভয়ের ভর বা ওজন সমান। কিন্তু আমরা জানি সামান্য পার্থক্য আছে। যেমন প্রোটনের ভর $1\cdot6715\times10^{-24}$ গ্রাম এবং প্রোটনের চেয়ে সামান্য ভারি নিউট্রন ভর

$$1\cdot675\times10^{-24}$$

আরও বলা উচিৎ ছিল 1টি প্রোটনের ব্যাস $2\cdot4\times10^{-23}$cm এবং নিউট্রনের ব্যাস $2\cdot4\times13=13$ cm

10নং প্রশ্নটিতে কোন পরমাণুর ভর সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা এক'—না বলিয়া 'প্রায়' এক বলিলে ভাল হত, কারণ হাইড্রোজেনের পরমাণুর সংখ্যা = I 003 এবং পারমাণবিক সংখ্যা = 1

22নং প্রশ্নটির উত্তরে হাইড্রোজেনে আইসোটোপগুলি ($_1H^1$), ($_1D^2$) এবং ($_1T^3$) হইবে না। ($_1H^1$), ($_1H^2$), ($_1H^3$) হইবে দয়া করিয়া জানাইবেন।

তাপস হালদার, 24 পরগনা,
সুদীপ চৌধুরী, মালদহ,

পড়াশোনা-ত্রিকোণমিতি

জানুয়ারি-88 সংখ্যায় "গণিতের উত্তর সম্পর্কে আলোচনা" মাননীয় অসীম মুখোপাধ্যায় (পৃষ্ঠা 53, ত্রিকোণ মিতির উদাহরণ) লিখেছেন ঃ—

বা. $h=\sqrt{3}x$...(1)

পুনরায় ABD সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\tan 30^\circ = = \frac{h}{x+60}$$

বা, $\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{h}{x+60,}$ বা. $x-60 = h\sqrt{3}=3x$, (1) এর সাহায্যে,

বা, $x=30$ মিটার।

জানি না উক্ত অংশটি লেখকের ভুল, না, ছাপার ভুল । তবে অংশ নিম্নোক্ত হওয়া প্রয়োজন ঃ

বা, $h=\sqrt{3}x$...(1)

পুনরায়, ABD সমকোণী ত্রিভুজে,

$$\tan 30^\circ=\frac{h}{x+60}$$

বা, $\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{h}{x+60,}$ বা $x+60 = h\sqrt{3}=3z$, (1) এর সাহায্যে।

বা, = 30 মিটার।

উত্তম মণ্ডল, কাকদ্বীপ, সুভাষনগর, 24 পরগনা (দঃ)।

সমযোজী না তড়িৎযোজী

আপনার পত্রিকায় গত May সংখ্যায় "চিঠিপত্র" অংশে HCL তড়িৎযোজী না সমযোজী প্রশ্নে সুদীপ রায়ের ব্যাখ্যাটি নির্ভুল নয় বলে আমার মনে হয়। সুদীপবাবু বলেছেন "CL এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা H অপেক্ষা অনেক কম।" কিন্তু CL এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা 3 এবং H এর 2·1। অর্থাৎ CL এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা H অপেক্ষা বেশী। এর পরের অংশে বলেছেন "জলীয় দ্রবণে H এ র প্রচণ্ড আকর্ষণ ক্ষমতা Cl এর ইলেকট্রনটি ছিনিয়ে নিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ধনাত্মক আয়ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং Cl ইলেকট্রন হারিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ঋণাত্মক আয়ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।" কিন্তু আমরা জানি কোন পরমাণু তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করলে ধণাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং এক বা একাধিক ইলেকট্রন বর্জন করলে ঋনাত্মক আয়নে পরিণত হয়। তাই যদি H পরমাণু CL এর ইলেকট্রনটি ছিনিয়ে নেয় CL তাহলে H ঋণাত্মক আয়ন রূপে এবং ধনাত্মক আয়ন রূপে আত্মপ্রকাশ করার কথা।

কিন্তু এর ব্যাখ্যা হবে HCL প্রকৃত পক্ষে সমযোজী যৌগ অর্থাৎ H এর একটি ইলেকট্রন এবং CL এর বাইরের কক্ষের একটি ইলেকট্রন সমভাবে ব্যবহৃত হয়ে H এর বাইরের কক্ষে দুটি এবং CL এর বাইরের কক্ষে আটটি ইলেকট্রন পূর্ণ হয়। আবার CL এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা H অপেক্ষা বেশী হওয়ায় দ্রবণে বা গলিত অবস্থায় CL, H এর ইলেকট্রনটি গ্রহণ করে এবং নিম্নলিখিত ভাকে বিয়োজিত হয়ে পড়ে, $HCl\rightleftharpoons H^+ + Cl^-$ এই অবস্থাতেই HCl তড়িৎযোজী যৌগের ন্যায় আচরণ করে।

জগন্নাথ ঘোষ, বর্ধমান।

বলতে পারো কেন ?

পত্রিকার February 1988 সংখ্যায় 'বলতে পারো কেন' এই বিভাগে কয়েকটি অসঙ্গতি রয়েছে সে বিষয়েই লিখছি।

(i) প্রথম প্রশ্নটিতে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, তাতে ব্যবহৃত সমীকরণটি দেওয়া হয়েছে —

$3Hcl + HNO_3 = Cl_2 + NOCl$

কিন্তু বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ হবে।

$3HCl + HNO_3 = 2Cl + 2H_2O$

কোরিন জায়মান অবস্থায় থাকবে এবং এই শক্তিশালী ক্লোরিনই সোনা, প্লাটিনাম প্রভৃতিকে দ্রবীভূত করে।

(ii) B.M.R এর পুরো নাম কী এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে Base Metabolic Rate। সটিক উত্তরটি হবে Basal Metabolic Rate।

দীপক বিশ্বাস, বিধানচন্দ্র ইন্সটিটিউশন, দুর্গাপুর-713205।

রসুনের উপাদান

গত জানুয়ারী, 88 সংখ্যায় 'জয়ন্ত মণ্ডল' মহাশয়ের লেখা 'রসুন' নিয়ে আলোচনাটি পড়লাম। লেখক বলেছেন সে, রসুনে ভিটামিন 'A' আছে। কিন্তু I.C.M.R-এর খাদ্যতালিকা অনুযায়ী 'রসুনে' ভিটামিন 'A' এর অনুপস্থিতির কথা লেখা আছে। আমি রসুনের বিভিন্ন উপাদান জানালাম।

রসুন (প্রতি 100 গ্রাম ওজনে)

প্রোটিন—6·3 গ্রাম

ফ্যাট—0·1 গ্রাম, শর্করা—29·8 গ্রাম

ক্যালসিয়াম—30 মিগ্রা

ফসফরাস—310 "

লোহা—1·3 "

ভিটামিন 'এ'—0 "

ভিটামিন 'বি'—·06 "

ভিটামিন 'সি'—13 "

নির্মলেন্দু মাইতি মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক কলেজ।

অ্যাকোয়া রিজিয়া

আমি আপনাদের বহুল প্রচলিত বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান'-এর নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকাটি পড়ে আমার খুব ভাল লাগে। পত্রিকাটি অত্যন্ত যুগপোযোগী। গত ফেব্রুয়ারী 1988 সংখ্যার সুধাংশু পাত্র মহাশয়ের 'বলতে পারো কেনো ?' রচনাটি পড়ে আনন্দ পেলাম। পিনাকী অধিকারীর উত্তরে তিনি জানিয়েছেন ঃ তিন আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক ও এক আয়তন গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণকে অ্যাকোয়া রিজিয়া বলে এবং এই দুটি অ্যাসিডের মিশ্রণে ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। [$3HCl + HNO_3 = Cl_2 + NOCl + 2H_2O$]

এর মধ্যে একটি মারাত্মক ভুল আছে। তিন ভাগ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং এক ভাগ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জায়মান ক্লোরিন [Cl] উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি এইরূপ ঃ

$3HCl + HNO_3 = 2Cl + NOCl + 2H_2O$

ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ী, বীরভূম।

মডেল নির্মাণ—১

আমি আপনাদের কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক। এই ম্যাগাজিনের বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয় বিষয় হল ইলেক্ট্রনিক মডেল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে প্রতিবারের প্রকাশিত সার্কিটগুলিতে কিছু না কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে। যেমন তালিকায় বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ওয়াটেজ দেওয়া থাকে না কিন্তু নিখুত মডেলের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি। ট্রান্সফরমরের volt এবং watt নামের সঙ্গে উল্লেখ থাকে না। তাছাড়া সার্কিটের ব্যাপারেও বিশদভাবে কিছু বর্ণনা করা থাকে না। সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ডিসেম্বরে প্রকাশিত মাল্টি পারপাস এলার্ম সার্কিটে। এই মডেলটি তৈরি করা সম্ভব নয়, কারণ সার্কিটে এলার্ম ইউনিটের কোন বর্ণনাই এতে দেওয়া নেই।

রিতেশ পাল 54/6 আর. এ. কে. রোড, কলি-55

মডেল নির্মাণ—২

আপনার পত্রিকার আমি একজন গুণগ্রাহী পাঠক। আপনার "শারদীয়া (1394) কিশোর "জ্ঞানবিজ্ঞান" পত্রিকায় 'নিজেকর' বিভাগে প্রকাশিত সৌম্য মিত্র মহাশয়ের 'হেডফোন রেডিও' —মডেলটি আমি বার বার Circuit Diagram মিলিয়ে করেছি। মডেলটি কাজও করছে, কিন্তু আমি মডেলটির কার্যকারিতায় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। মডেলটিতে যে সমস্যার সম্মুখিন হয়েছি সেগুলি মডেলটির 'ত্রুটি' না 'বৈশিষ্ট্য' বুঝতে পারছি না। সমস্যাগুলির যথাযথ বৈজ্ঞানিক কারণ ও সমাধানের উপায় সৌম্য মিত্র মহাশয় বা ইলেক্ট্রনিক্সে বিশেষজ্ঞ ও মডেলটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এমন ব্যক্তির পরামর্শ আপনার পত্রিকার মাধ্যমে চিঠিপত্র বিভাগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশিত করলে আমি ও আরও অনেকে বিশেষ উপকৃত হইব। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ —

(i) রেডিওটিতে শুধুমাত্র আকাশবাণী কলিকাতার পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগ অর্থাৎ সকালে 505·5 মিটারে ও বিকালে 250 মিটারে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি শোনা যায়।—এই রেডিওটিতে কি অন্যান্য সাধারণ রেডিওর মতো MW (মিডিয়াম ওয়েভের) স্টেশনগুলি ধরবে না ?

(ii) এই মডেলের বেশিরভাগ Components-গুলির তুলনায় F, Rod (Ferrite Rod)-টি বেশ বড়। ঐটিকে কি কোন উপায়ে ছোট করা যায় না ?

আশাকরি আমার চিঠির উত্তর পাব।

অপূর্ব দত্ত গোডাউন কলনি,

মহাকাশ গবেষণায় ভারত

সমরজিৎ কর

এ বছর মার্চ মাসে বিশেষ এক ধরণের ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠান হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম ইনডিয়ান রিমোট সেনসিং স্যাটেলাইট। সংক্ষেপে IRS। উপগ্রহটি তৈরি করেছেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানী এবং কুশলীরা। উপগ্রহটির ওজন 950 কিলোগ্রাম। এটি মহাকাশে পাঠান হয়েছে সোভিয়েত দেশের মহাকাশ উৎক্ষেপন কেন্দ্র বৈকানুর থেকে। বৈকানুর কাজাখস্তানে অবস্থিত। উপগ্রহটি উৎক্ষেপনের জন্যে কাজে লাগান হয়েছে সোভিয়েত কুশলীদের তৈরি ভোস্তক রকেট। এত ভারী একটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাতে গেলে দরকার শক্তিশালী রকেট। দেশে একটা শক্তিশালী রকেট এখনো পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয় নি বলেই ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সাস্থাকে সোভিয়েত রকেটের সাহায্য নিতে হয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে গত বছর বাঙ্গালোরে এই সংস্থার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউ আর রাও-এর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, অনেকগুলি IRS উপগ্রহই মহাকাশে পাঠাবেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। প্রথমটি সোভিয়েত দেশের সাহায্যে পাঠান হলেও, পরেরগুলি ভারত থেকেই পাঠান হবে। এর জন্যে ভারতীয় কুশলীরা তৈরি করছেন বিশেষ এক ধরনের রকেট। নাম পোলায় স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহ্‌কল। সংক্ষেপে PSLV। এই রকেটের ওজন দাঁড়াবে 275 টন; উচ্চতা 44 মিটার। এর সাহায্যে 1000 কিলোগ্রামের উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপ করা সম্ভব হবে। প্রথম উপগ্রহটির নাম রাখা হয়েছে IRS-IA। এটি সোভিয়েত দেশের সাহায্য নিয়ে মহাকাশে উৎক্ষেপ করা হলেও, এই সিরিজের পরের উপগ্রহগুলি ভারতের মাটি থেকেই মহাকাশে পাঠান হবে। আর তা করা হবে ভারতের অন্ধ্রদেশের উপকূলবর্তী শ্রীহরিকোটার উৎক্ষেপন মঞ্চ থেকে। PSLV রকেটের সাহায্যে।

উৎক্ষেপনের পর IRS-IA পৃথিবীকে পরিক্রমণ করবে বিশেষ একটি কক্ষ পথে। পৃথিবীর দুই মেরুর উপর দিয়ে চলে গেছে এই কক্ষপথ। কক্ষপথটির দূরত্ব ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 904 কিলোমিটার। ইংরেজিতে এই কক্ষটিকে বলা হচ্ছে Sun-Synchronous orbit। বাংলায় তোমরা বলতে পার সূর্য-সমলয় কক্ষপথ। উপগ্রহটি প্রতিবার

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যে
বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না
জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

বিষয়সূচী

অপ্রকাশিত রচনা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের
অপ্রকাশিত পত্রাবলী

বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অদ্রীশ বর্ধন
ও সমরজিৎ কর

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সংকর্ষণ রায় ॥ নারায়ণ সান্যাল
কিন্নর রায় ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী

রঙিন চিত্রকাহিনী

দিলীপ দাস ॥ গৌতম কর্মকার

নিজে নিজে কর

বিপ্লব ব্যানার্জী ॥ সৌম্য মিত্র ॥ দিলীপ পাঠক
নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র ও অনেকে

সচিত্র প্রবন্ধ : বিচিত্র জীবজগৎ

রতনলাল ব্রহ্মচারী ॥ অজয় হোম ॥ সুবীর দত্ত
তপন কুমার আদক ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস
তারক মোহন দাসও অনেকে

নির্বাচিত পুনর্মুদ্রণ

জগদীশ চন্দ্র বসু ॥ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ও অন্যান্য

ছড়া ও কবিতা

অন্নদাশংকর রায় ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কৃষ্ণ ধর ॥ অমিতাভ চৌধুরি ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু
অমিত রায় ও অনেকে

এ ছাড়া অজস্র আকর্ষণ

বেরোবে মহালয়ার আগেই

পরিক্রমণের সময় নির্দিষ্ট স্থানীয় সময়ে একই দ্রাঘিমা-অঞ্চল অতিক্রম করে। এর ফলে ওই অঞ্চলটি অতিক্রম করার সময় উপগ্রহের পর্যবেক্ষক যন্ত্রপাতি সব সময় আলোকিত অবস্থায় দেখতে পায়।

হয়ত জিজ্ঞেস করবে, এ ধরনের উপগ্রহে কী লাভ ?

ব্যাপারটা তা হলে পরিষ্কার করা যাক। ইংরেজিতে বলা হচ্ছে রিমোট সেনসিং স্যাটেলাইট। বাংলা তার অর্থ দাঁড়ায় দূর অনুভবকারী উপগ্রহ। আমাদের ভারত বিরাট একটি দেশ। তার কোথাও পাহাড় পর্বত। কোথাও বিস্তৃত সমভূমি। ভারতের এক এক অঞ্চলের আবহাওয়া এক এক রকম। ঋতুর পরিবর্তনে আবার তা পালটায়। অজস্র নদনদী, খাল, হ্রদ। কোথাও অরণ্য। মাটির উপর চলাফেরা করে এ সবের সঠিক পরিচয় পাওয়া শক্ত। তাই পৃথিবীর বহু দেশ এ কাজে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নিচ্ছে।

ধরো, দেশের কোন দুর্গম অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ সামগ্রী। সে সব অঞ্চল যে সঠিক কোথায় তার হদিশ মেলা শক্ত। জায়গাগুলিও এতই দুর্গম যে গাড়ি চড়ে, এমন কি পায়ে হেঁটে অনুসন্ধান চালাবে তার জো নেই। ওই সব অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ হয় আলো। দৃশমান আলো এবং অদৃশ্য অবলোহিত রশ্মি। কৃত্রিম উপগ্রহে রয়েছে বিশেষ ধরনের ক্যামেরা। সেই ক্যামেরার সাহায্যে তোলা হয় ওই সব অঞ্চলের ছবি। ছবিগুলি পরে কমপিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে বলে দেওয়া যায়, যে সব অঞ্চলের ছবি সেখানকার মাটি কী উপাদান ; সেখানে কোন খনিজ পদার্থ আছে কী না, থাকলেও কোন কোন খনিজ পদার্থ কী পরিমাণে রয়েছে। এতে লাভ অনেক। সাধারণ পদ্ধতিতে লোকলস্কর নিয়ে সে সব জায়গা খুঁজে বের করতে সময় লাগে অনেক। খরচও প্রচুর। অথচ দেখ, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্থানটির সন্ধান পাওয়া যায়। হোক জায়গাটি দুর্গম। তবু, যদি একবার জানা যায় সেখানে প্রচুর খনিজ পদার্থ রয়েছে, তা উদ্ধার করলে লাভ হবে, তা হলে খরচ করে কাজে লেগে পড়া যেতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কত রকম ফসলের চাষ করা হয়। কোন অঞ্চলে কোন্ কোন্ ফসল কতটা হল, কোথায় ফসল নষ্ট হল, এ সব খবরও পাওয়া যায় দূর অনুভূতিক্ষম উপগ্রহের সাহায্যে। দেখা গেল কোন অঞ্চলে পোকার আক্রমণ হচ্ছে। অথবা দূর থেকে উড়ে আসছে পঙ্গপাল। দূর অনুভবক্ষম ক্যামেরায় তা ধরা পড়বে। তখন পঙ্গপালের দল জমিতে পড়ার আগেই বিমানের সাহায্যে আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় তাদের উপর কীটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে তাদের ধ্বংস করা যাবে। দেশের কোন অঞ্চলের অরণ্যে দেখা গেল দাবাগ্নি। আকাশ থেকে ছবি তুলে তাও জানা যায়। ফলে সময় মত অরণ্যের আগুন নেভানর ব্যবস্থা করা যায়। কোথাও হয়ত প্লাবন ঘটল, অথবা অতিবৃষ্টিতে গৃহস্থের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হল। উপগ্রহের ক্যামেরা এ সবের ছবি তুলে মুহূর্তের মধ্যে জানিয়ে দিতে পারে। ফলে দ্রুত সাহায্যের ব্যবস্থাও করা যায়। স্থলভাগ এবং জলভাগে খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস কোথায় সমুদ্রে কখন কোন অঞ্চলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতে পারে—এমন অনেক খবরই আমরা দূর অনুভবকারী কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে জেনে নিতে পারি। এ ব্যাপারে এতকাল আমাদের সাহায্য নিতে হয়েছে বিদেশী উপগ্রহের সাহায্যে। তাতে প্রচুর খরচ হয়। তার চেয়ে বড় কথা, থাকতে হয় অন্য দেশের মুখ চেয়ে। এবার থেকে তার আর দরকার হবে না। ভারতে তৈরি উপগ্রহই আমাদের এ সব কাজে সাহায্য করবে।

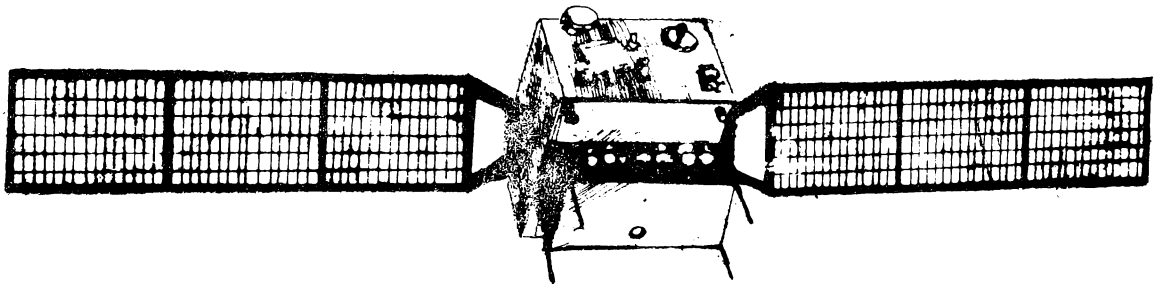

I. R. S.—IA

ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

রবীন্দ্রনাথ

(ভারতবর্ষের ইতিহাস : ১৩০৯)

আই. সি. এ. ২৪৯৭/৮৮

বিজ্ঞানের খবর

10 লাখ বছরের ডিম

এবার পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ডিমের সন্ধান পাওয়া গেছে। লণ্ডনের 130 কিঃ মিঃ দূরে পশ্চিমে বৃস্টল নামক মিউজিয়ামে ডিমটি যত্ন করে রাখা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে এই ডিমটি 10 লাখ বছরের পুরাতন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে যে বৃহৎ আকারের এ ডিমটি কোন পাখীর। তাদের মতে 17শ শতকে আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে (বর্তমানে মাদাকাস্কার নামে পরিচিত) এলিফ্যান্ট বার্ড নামে এক ধরনের বড় পাখীর অস্তিত্ব ছিল। পঞ্চাশের দশকেও ঐ এলাকায় বালির নিচে কিছু পাখীর ডিম পাওয়া যায়। এই প্রমাণের ভিত্তিতে এটি এলিফ্যান্ট বার্ড পাখীর ডিম একথা জানা যায়।

হৃদরোগের সহায় রসুন

রসুন রক্তের জমাট বাঁধাকে তরল করতে পারে। রক্ত জমাট বেঁধে হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জাপানের একটি চিকিৎসা গবেষণা দল এ তথ্য প্রকাশ করেছে। নিহগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ডঃ তিয়োহিকো আরিগা (19 মার্চ 88) বলেন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় রসুন নির্গত পদার্থ থেকে এ্যালিল ট্রাইসাল ফাইড রক্তের ছোট পর্দায় (ব্লাড প্লেটলেস) জমাট বাঁধাকে তরল করে। এই তথ্য জাপানের কৃষি-রসায়নবিদ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সবচেয়ে বিষধর সাপ

গোখরো সাপের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বিষধর সাপ হচ্ছে – ভারত, বাংলাদেশ, শ্যাম, মালয়, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন দীপপুঞ্জের রাজ গোখরো। এরা 18 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং সাপই এদের প্রধান খাদ্য। অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার রাজগোখরো সবচেয়ে বেশি বিষধর।

একশো বছর আয়ু

ইচ্ছা করলে এখন সবাই একশো বছর বাঁচতে পারে। জাপানে 636 জন লোক একশো বছর বেঁচে ছিলেন। বিজ্ঞানীরা এই 636 জন লোকের উপর দীর্ঘদিন গবেষণা করে 1987 সালের 18 ডিসেম্বর ঘোষণা করেছেন যে মানুষকে একশো বছর বাঁচতে হলে প্রচুর পরিমান শাক-সব্জি ও তরি-তরকারী খেতে হবে। প্রতিদিন 12-14 ঘণ্টা ঘুমোতে হবে এবং মনকে বেশির ভাগ সময় চিন্তামুক্ত রাখা প্রয়োজন। টোকিওতে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

—জয়ন্ত মণ্ডল

মেট্রো যাত্রীরাই মেট্রোরেলের গর্ব

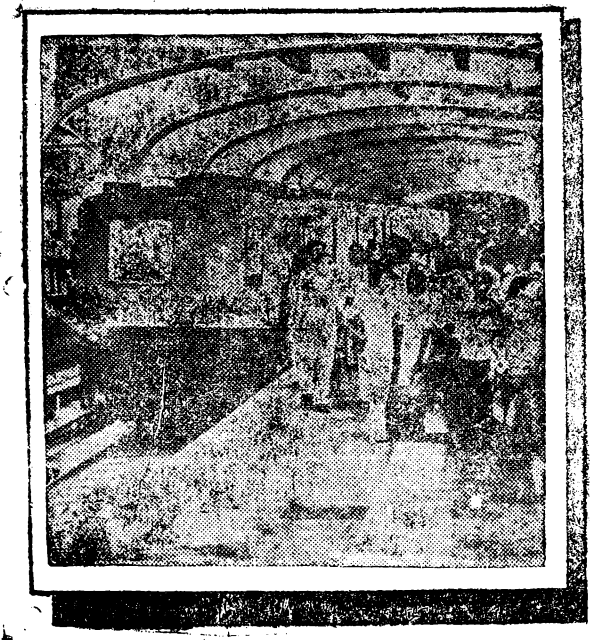

নগর পরিবহণ প্রসঙ্গে মেট্রোরেল এবং তার বিভিন্ন স্টেশনকে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতার জন্য কলকাতার জনগণকে আমি অভিনন্দন জানাই। এ সত্যই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, দায়িত্বশীল ও সচেতন যাত্রীদের সুব্যবহারের ফলে কি করে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হন।

(গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ লোকসভায় রেল বাজেট প্রসঙ্গে মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী মাধব রাও সিন্ধিয়ার বক্তব্য)

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

medium

নির্ভরশীল
প্রিয় সঙ্গী
মুগুর ছাপ®
অজন্তা
হাওয়াই®
বণিক রবার ইন্ডাস্ট্রীজ
কলিকাতা
এর জুড়ি নেই
IDEAL

KJB/3

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার / চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

রাজা রাণী অবশ্য কলম্বাসকে ত্যাগ করলেন না। কিন্তু অনিবার্য ভাবেই কলম্বাস অনুভব করলেন– তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ হবে না। অতএব আতিথ্যের পালা সাঙ্গ করে দুর্নিবার পথিক আবার বেরিয়ে পড়লেন অনিশ্চিতের সন্ধানে। তাঁর স্বপ্ন কি সার্থক হবে না? তাঁর আজন্মলালিত বিশ্বাস কি সত্যিই ভ্রান্ত?

অসম্ভব। হিউয়েলভার কাছে লা র‍্যাবিডায় কলম্বাসের আশা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মঠবাসী এক জ্যোতির্বিদ অ্যান্টোনিও-ডি-মার্সেনা আর প্যালোস বন্দরের এক সুখ্যাত নাবিক মার্টিন পিনজন তাঁকে সমর্থন করলেন। পিনজন তাঁর এক বছর আগের অভিজ্ঞতা কলম্বাসকে শোনালেন। গিয়েছিলেন রোমে। সেখানের এক বিশ্বতত্ত্ববিদ পণ্ডিতও এমনি অনাবিষ্কৃত এক ভূখণ্ডের কথা তাঁকে বলেছেন, মানুষের পদচিহ্ন যেখানে পড়েনি, কিংবা সভ্য পৃথিবীর পতাকা যার মুখ এখনো দেখেনি। নূতন ভূখণ্ড—আশায় আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলেন কলম্বাস। পিনজনকে তাঁর সহগামী হবার প্রস্তাব করলেন।

মার্সেনা আর পিনজন কিন্তু এইখানেই থেমে রইলেন না। তাঁরা আবেদন করলেন রাণীর দরবারে – আপনার কমিশন সুবিচার করেনি। কলম্বাস অভ্রান্ত। তাঁকে সামর্থ দিয়ে আপনি উজ্জ্বল করে তুলুন স্পেনের ভবিষ্যৎ।

ইসাবেলা উন্মুখ। তিনি কলম্বাসকে ডাকলেন। সাহায্য তিনি করবেন, কিন্তু কলম্বাস তাঁর এই জীবনপণ জলযাত্রার বিনিময়ে কী চান, তা জানতে চাইলেন ইসাবেলা।

1492 খৃষ্টাব্দের 2 জানুয়ারী গ্রানাডার পতন হোল। নগরীর আত্মসমর্পণের অবিস্মরণীয় মুহূর্তটিতে কলম্বাস পৌঁছলেন। রাজদম্পতি তখন বিজয়গর্বে চঞ্চল। কলম্বাসও স্পন্দিত হলেন এই পরমতম মুহূর্তে। সুদীর্ঘ কালের জীবন সংগ্রাম পার হয়ে আমন্ত্রণ লাভের সৌভাগ্য তাঁকে দুরাকাঙ্খী করে তুললো। কলম্বাস

বললেন—মহান রাণী, আমি যদি সফলকাম হই, তবে স্পেনের নামে যে সকল দ্বীপ বা দেশ আমি অধিকার করবো, আমিই হবো সেখানকার রাজপ্রতিনিধি। পশ্চিম আটলান্টিকের যে সুদীর্ঘ জলপথ আমি পার হবো সেই জলপথে আমি হবো আপনার নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষ থেকে যে সমস্ত সম্পদ আমি অধিকার করে আনবো স্পেনের নামে, তার এক—দশমাংশ হবে আমার। পুত্রে পৌত্রাদিক্রমে সেই সম্পদের মাধ্যমে আমার নাম পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবে। মহান রাণী, এই আমার আকাঙ্খিত পুরস্কার।

চমকে উঠলেন রাণী ইসাবেলা। কলম্বাসের স্পর্ধায় ফার্দিনান্দও প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কোনও কথা আর হোল না।

দিনের পর দিন চলে গেল উত্তরের অপেক্ষায়, উত্তর এলো না। 1492 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলেন কলম্বাস। তারপর স্থির করলেন—এবার ফ্রান্স না হয় ইংল্যান্ড, যাত্রাতাঁকে করতেই হবে।

অবিচলিত কলম্বাস কোনও আপোষের কথা ভাবলেন না। তিনি ফ্রান্সের পথে অগ্রসর হলেন নতুন উদ্দীপনায়। ভাগ্যবান কলম্বাস, রাজসভার অনুরাগীরা তাঁকে ভুলে তখনো যাননি। তাই ইসাবেলার কাছে তাঁরা দরবার করলেন—দোহাই মহারাণী, কলম্বাসকে ফেরান। পোর্তুগালের রাজা জন এখনো উন্মুখ হয়ে আছেন কলম্বাসের অপেক্ষায়। ওদিকে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ড, এ সুযোগ যারাই লাভ করুক, বঞ্চিত হবে স্পেন।

রাণী ইসাবেলার দূত আর দেরী করলো না। গ্রানাডা থেকে 6 মাইল দূরে পিনোস সেতুমুখে কলম্বাসের পথ রোধ করে সে দাঁড়ালো। কলম্বাস ফিরে এলেন এক বিজয়ী বীরের মহিমায়। 1492 খৃষ্টাব্দের 17 এপ্রিল স্বাক্ষরিত হোল ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র। প্রতীক্ষার কাল পার হয়ে এবার কালজয়ী অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব। রাজ্যজয়ের চেয়ে আরো অনেক অনেক বড়, অনেক মহীয়ান এই মহাসমুদ্র আটলান্টিকের এক অনাবিষ্কৃত জলপথ পার হয়ে ভারতবর্ষের স্বর্ণদ্বার। ইতিহাসের রাজ পথে আপন পদধ্বনি এবার শুনতে শুরু করলেন কলম্বাস।

1499 খৃষ্টাব্দের 3 আগষ্ট প্যালোস বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করলো তিনটি জাহাজ—সান্তামারিয়া, পিন্টা আর নিনা। 52 জন নাবিক সহ 100 টন ওজনের পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজ - সান্তা মারিয়ার পরিচালনভার স্বয়ং গ্রহণ করলেন কলম্বাস। 50 টনের ছোট্ট জাহাজ পিন্টার দায়িত্ব নিলেন মার্টিন পিনজন। সঙ্গে 18 জন নাবিক। আর 40 টনের নিনা ভেসে চললো মার্টিনের ছোটভাই

ভিনসেন্ট পিনজনের নির্দেশে। 88 জন নাবিকের এই জল যাত্রার পিছনে কোনও উদ্দীপনা কিন্তু কোথাও ছিল না। টাকার লোভ আর রাজার আদেশে তারা নিরুপায় হয়ে অনেকেই এসেছিল। আর বাকী এসেছিল জেলখানার কয়েদী। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েকজন আসামী আর মৃত্যুদণ্ডের হুকুম নিয়ে যারা কাল যাপন করছিল কারাগারের অন্ধকারে। প্যালোস বন্দরের সমুদ্রতীরে কোনও জয়ধ্বনি তাই শোনা গেল না। নাবিকদেরযারা আপনজন তাদের অভিশাপ আর ধিক্কার নিয়ে কলম্বাস যাত্রা শুরু করলেন ভবিতব্যতার এক অভ্রান্ত ইঙ্গিত মাত্র সম্বল করে। সঙ্গে কর্মবহুল যৌবনের অভিজ্ঞতা আর অটল প্রত্যয়।

(ক্রমশ)

পাতাকাটা পিঁপড়ে

বৈজ্ঞানিক নাম এ্যাটা সেফালোটেস (Atta-cephalotes)। দক্ষিণ আমেরিকার এই বিশেষ ধরনের পিঁপড়েরা এমনিতে সাধারণ পিঁপড়েদের থেকে কিছু আলাদা নয়, অন্যান্যদের মতই সামাজিক। কিন্তু নাম থেকে কিছুটা অনুমান করা যায় এরা অন্যান্যদের থেকে আলাদা। খাওয়ার পদ্ধতি এদের বিচিত্র। খাওয়ার বস্তু মূলতঃ ছত্রাক। বহু পরিশ্রম করে এই ছত্রাক এরা এদের বাসার মধ্যে তৈরি করে।

এই ছত্রাক তৈরি করার ব্যাপারটা একটা মহাযজ্ঞের মত। মাটির তলায় এদের বিশাল বাসার প্রবেশ মুখ অনেকটা আগ্নেয়গিরির মুখের মত। সেখান থেকে একদল পিঁপড়ে গাছে উঠে টুকরো টুকরো পাতা কেটে নিয়ে আসে। একদল পিঁপড়ে সেই পাতাকে চিবিয়ে কুচি কুচি করে মন্ড করে ফেলে। এই কুচি পাতার মধ্যেই এদের আরেক দল প্রচুর পরিমাণে ছত্রাক তৈরি করে। আর এই ছত্রাকই গোটা পরিবারের খাবার যোগায়। বাসা ছেড়ে রানী পিঁপড়ে অন্য বাসায় চলে গেলে একটু ছত্রাক নিয়ে যায় বীজ হিসেবে।

অলয় ঘোষাল

ফ্লোরিন অমরনাথ রায়

পর্যায় সারণীর নয় নম্বর মৌলটির নাম ফ্লোরিন। ফ্লোরিন হ্যালোজেন গোষ্ঠীর মৌলগুলির প্রথম সদস্য। এর চিহ্ন F, আণবিক সংকেত F_2, পরমাণু ক্রমাংক 9, পারমাণবিক গুরুত্ব 19·0, ইলেকট্রন বিন্যাস 15^2 25^2 $2p^5$, পর্যায় সারণীতে স্থান গ্রুপ VII B তে, স্ফুটনাংক—187·9°C, গলনাংক—223°C এবং ঘনত্ব 1·108 গ্রাম/সি. সি.। ফ্লোরিনের যোজ্যতা হলো I (এক)। মৌলটিকে F^{19} চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ফ্লোরিন সবচেয়ে বেশি তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল। ফ্লোরিন নামটাল্যাটিন শব্দ fluo অর্থাৎ কিনা 9 flow থেকে এসেছে।

ফ্লোরিনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রসায়ন বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যদ্বানী করার পরও একশো বছর কেটে যায় মৌলটিকে গ্যাসীয় অবস্থায় পেতে। কিন্তু কেন?

প্রথমতঃ খুবই সঙ্গত কারণে ফ্লোরিন প্রস্তুতিতে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে উৎপন্ন ফ্লোরিন জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৎক্ষণাৎ কিছুটা ওজন সহ অক্সিজেন পাওয়া যায়। কাজেই ফ্লোরিনের অত্যন্ত রাসায়নিক সক্রিয়তার দরুণ এই পদ্ধতি সার্থক হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ অনার্দ্র হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড তড়িৎ অপরিবাহী বলে, এর থেকে ফ্লোরিন প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়তঃ ফ্লোরিন দ্বারা আক্রান্ত হয় না, এমন পদার্থের পাত্র ও তড়িৎদ্বার তখন পর্যন্ত অজানা ছিল।

তৃতীয়তঃ ফ্লোরিন ও হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড উভয়েই বিষাক্ত এবং মানুষের শরীরের চামড়ার ক্ষয়কারী পদার্থ। এই কারণে এদের নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করা খুবই বিপজ্জনক ছিল। চতুর্থতঃ হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড একটি উদ্বায়ী তরল পদার্থ, যার স্ফুটনাংক 19 4°C. কাজেই তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটানোর জন্যে আরও নিম্ন উষ্ণতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেকালে প্রয়োজনীয় শীতলতা সৃষ্টিকারী উপযুক্ত কোন পদার্থের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরিচয় ছিল না।

ফ্লোরিনকে প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না বটে তবে যুক্ত অবস্থায় ফ্লোরিনকে অনেক যৌগ রূপে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। ভূত্বকে প্রায় 0 072% ফ্লোরিন আছে। ফ্লোরিনের যৌগগুলি প্রকৃতিতে পাললিক ও আগ্নেয়শিলার বর্তমান। এই মৌলটির প্রধান প্রধান যৌগগুলির মধ্যে ফ্লোরস্পার, ফ্লোর অ্যাপাটাইট ও ক্রায়োলাইট অন্যতম।

1813 খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী ডেভি লক্ষ্য করেন যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মত ধর্মবিশিষ্ট একটি অনাবিস্কৃত মৌল দ্বারা গঠিত। ডেভি, গোরে এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী ফ্লোরিন প্রস্তুত করার চেষ্টায় বিফল হন। একজন সাফল্য লাভ করেন বিজ্ঞানী ময়সাঁ (Moissn) 1886 খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ঐ সালে পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডকে (KHF_2) অনার্দ্র হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের (HF) এর মধ্যে দ্রবীভূত করে প্ল্যাটিনাম ও ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর পাত্রে ঐ একই ধাতু-সংকর দ্বারা তৈরি তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে ফ্লোরিন তৈরি করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে ভেনিস, ডীভার প্রমুখ রসায়নবিদগণ ময়সাঁর পদ্ধতির কিছুটা সংশোধন সাধন করেন এবং এই সংশোধিত পদ্ধতিই অধুনা ফ্লোরিন প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়।

ফ্লোরিন ঈষৎ হলুদ বর্ণের গ্যাস। এই গ্যাস তীব্র গন্ধযুক্ত এবং অত্যন্ত বিষাক্ত। সহজেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে আক্রমণ করে। গ্যাসটি বায়ু অপেক্ষা ভারী—230°C উষ্ণতায় ফ্লোরিন হলুদ রঙের কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। হাইড্রোজেনের প্রতি ফ্লোরিনের প্রবল আসক্তি আছে। হাইড্রোজেনের সঙ্গে ফ্লোরিনের বিক্রিয়ায় গঠিত হয় হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড। আর্দ্র বায়ুতে ফ্লোরিন হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড উৎপন্ন করে এবং ধূমায়িত হয়। ময়সাঁর পদ্ধতিতে উৎপন্ন ফ্লোরিন গ্যাসকে প্ল্যাটিনাম নির্মিত গ্যাসজারে বায়ুর ঊর্দ্ধাপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। শীতল ও লঘু অথবা গাঢ় কস্টিক সোডা দ্রবণের সঙ্গে ফ্লোরিন বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ফ্লোরাইড যৌগ উৎপন্ন করে। অক্সিজেন, সালফার, ফসফরাস ও আয়োডিনের সঙ্গে এবং প্রায় সমস্ত ধাতুর সঙ্গে ফ্লোরিন বিক্রিয়া করে ফ্লোরাইড যৌগ উৎপন্ন করে। আবার বোরন, কার্বন, ব্রোমিন ও আয়োডিনের সঙ্গে ফ্লোরিনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ফ্লোরাইড যৌগ। ধাতব কপারকে যদি ফ্লোরিনের সান্নিধ্যে রাখা যায় তবে কপারের উপরে কিউপ্রিক ফ্লোরাইডের একটি সংরক্ষণমূলক স্তর গঠিত হয়, যার জন্যে কপার নির্মিত পাত্রে ফ্লোরিন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। আবার অ্যালকোহল, ইথার, তারপিন তেল প্রভৃতি যৌগগুলি ফ্লোরিনের সান্নিধ্যে এলেই জ্বলে ওঠে। ফ্লোরিনের তীব্র জারণধর্মও আছে। হাইড্রোকার্বন যৌগের ফ্লোরিনেশন ক্রিয়ায় ফ্লোরিন ব্যবহৃত হয়। ফ্লোরিনের একটি যৌগের নাম 'ফ্রিয়ন' (CF_2 CL_2)। আজকাল শীতলীকরণের কাজে অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে 'ফ্রিয়ন' ব্যবহৃত হয়। মৌল ফ্লোরিনের ব্যবহার খুবই কম, তবে মুক্ত ফ্লোরিন ফ্লোরোকার্বন (টেফলন) নিষ্ক্রিয় গ্রীজ ও নিষ্ক্রিয় দ্রাবক প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

বাইনারি পদ্ধতি

কম্পিউটার ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র। তাকে নিয়ে কোনো কাজ করাতে হলে বৈদ্যুতিক সংকেতের সাহায্যে নির্দেশ পাঠাতে হয়। এই বিদ্যুৎ সংকেতে থাকে কেবল মাত্র দুটি ভোল্টেজ, 5 ভোল্ট আর 0 ভোল্ট, যাকে সাংকেতিক ভাবে যথাক্রমে Logic 1 (অথবা শুধু মাত্র 1) এবং Logic 0 (অথবা শুধু মাত্র 0) বলা হয়। কম্পিউটার C, P, U কে যাবতীয় নির্দেশ, তথ্য এই Logic 1 আর Logic 0র সাহায্যে পাঠানো হয়। কেবল মাত্র দুটি ভোল্টেজ বা লজিক লেভেলের ব্যবহারকে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে বলা হয় বাইনারি পদ্ধতি (Binary System)

বাইনারি পদ্ধতি যে শুধু কম্পিউটারেই ব্যবহার হয় তাই নয়, টেলিগ্রাফের সাহায্যে খবর পাঠাতেও আমরা এক রকম বাইনারি পদ্ধতি ব্যবহার করি যার নাম মর্স কোড (Morse Code)। স্যামুয়েল মর্স (যার নামে এই মর্স কোড) প্রতিটি ইংরিজি হরফ আর 0 থেকে 9 অবধি সংখ্যার জন্য ডট্ আর ড্যাশের একটি তালিকা বা কোড তৈরি করে-ছিলেন। টেলিগ্রাফে খবর পাঠানোর সময় টেলিগ্রাফের তারের মাধ্যমে ডট্ আর ড্যাশের বিদ্যুৎ সংকেতই পাঠানো হয়। যেমন মর্স কোডের সাহায্যে ইংরিজি A পাঠাতে হলে প্রথমে একটি ডট্, তারপর একটি ড্যাশের বিদ্যুৎ সংকেত পাঠাতে হয়। Aর পরিবর্তে যদি Y পাঠাতে হয় তবে মর্স কোড অনুসারে পরপর ড্যাশ ডট্, ড্যাশ, ড্যাশ বিদ্যুৎ সংকেত পাঠাতে হয়। কম্পিউটারের C, P, U তেও যখন আমাদের কোনো তথ্য পাঠাতে হয় তখন এরকমই তালিকার বা কোডের প্রয়োজন হয়। কম্পিউটারে তথ্য পাঠাবার জন্য অনেকগুলি জনপ্রিয় কোড আছে যেমন ASCII (উচ্চারণ অ্যাশকি), EBCDIC (উচ্চারণ এবসিডিক) ইত্যাদি। এই কোডগুলিতে সমস্ত ইংরিজি অ্যালফানিউমারিক (Alphanumeric) হরফের জন্য এক একটি আলাদা 5 ভোল্ট আর 0 ভোল্ট বিদ্যুৎ সংকেতের তালিকা করে দেওয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি অ্যালফানিউমারিক ক্যারেকটার বলতে ইংরিজি বর্ণমালার Capital এবং Small হতে (অর্থাৎ A থেকে Z অবধি), 0 থেকে 9 অবধি সংখ্যা, Punction mark (যেমন , . ; / : ইত্যাদি), গণিতে ব্যবহার করা হয় এমন সমস্ত চিহ্ন (হেমন + — × % ইত্যাদি) এবং কয়েকটি বিশেষ চিহ্নে যেমন £, @, ≠, $ ইত্যাদি বোঝায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ASCII (পুরো কথাটি হলো AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE) কোড A পাঠাতে হলে আমাদের পাঠাতে হয় 1000001 বাইনারি সংকেত। অপর পক্ষে EBCDIC (পুরো কথাটি হলো EXTENDED BINARY CODED DECIMAL INTERCHAGE CODE) কোডে যদি A পাঠাতে হয় তা হলে সংকেতটি দাঁড়ায় 11000001.

আবার একবার মনে করিয়া দিই, 1 কিম্বা 0 গুলি কিন্তু যথাক্রমে 5 ভোল্ট 0 ভোল্ট বিদ্যুৎ সংকেতের প্রতিনিধি স্বরূপ। বাস্তবে ASCII Code এর সাহায্যে A হরফটি কম্পিউটারে পাঠাতে হলে C, P, U তে এক সঙ্গে সাতটি তারের মাধ্যমে 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ভোল্ট বিদ্যুৎ পাঠাতে হয়। কম্পিউটার প্রযুক্তিতে 5 ভোল্ট বা 0 ভোল্ট যে কোনো একটি সংকেতকে বলা হয় এক বিট্ তথ্য (I bit information or date) যে C, P, U যত বিট্ তথ্য এক সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারে, সেই C, P, U কে তত বিটের C, P, U বলা হয়। যেমন 8 bit C, P, U গুলি এক এক বারে 8 bit করে তথ্য পড়ে এবং কাজ করে। 16 bit C, P, U গুলি একবারে 16 bit তথ্য নিয়ে কাজ করে। এক এক বারে বেশী বেশী তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারার জন্য 16 bit C, P, U গুলি 8 bit এর থেকে আরো দ্রুত কাজ করে। ঠিক তেমনি 32 bit এর C, P,U-গুলি আবার 16 bit এর থেকে দ্রুত কাজ করতে পারে। সব থেকে দ্রুত কাজ করে 64 bit C, P, U যে গুলি সুপার কম্পিউটারে বাবহার করা হয়। বাড়িতে ব্যবহারের জন্য ছোট Home Computer এ থাকে 8 bit C, P, U পকেট কম্পিউটারে থাকে 4 bit আর অফিস, ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয় যে সমস্ত Micro এবং Mini Computer, তাতে লাগানো থাকে 16 bit আর 32 bit এর C, P, U.।

ASCII এবং EBCDIC Code ছাড়াও আরো কত

ASCII CODE

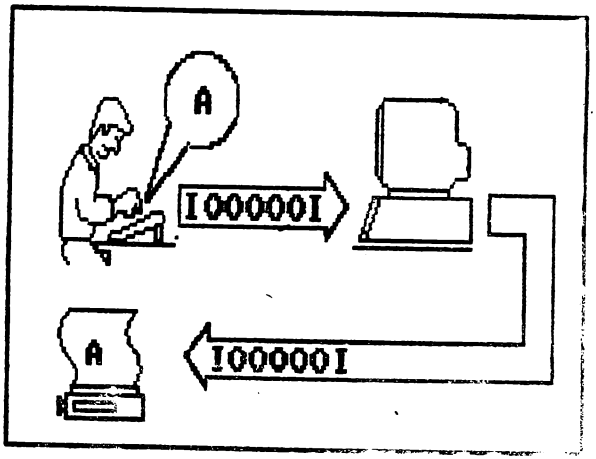

গুলি কোড আছে। যেমন 8 bit ASCII Code বলেও একটি Code আছে যাতে EBCDIC Code এর মত যে কোনো অ্যালফানিউমারিক ক্যারেকটোর বোঝাতে 8 bit বাইনারি সংকেত ব্যবহার করা হয়। তালিকা 1 এ চোখ বোলালেই বোঝা যাবে কি ভাবে A হরফটি বিভিন্ন কোডে বিভিন্ন বাইনারি সংকেতের সাহায্যে বোঝানো হয়।

হরফ	কোড	সংকেত
A	Morse 7 bit ASCII EBCDIC 8 bit ASCII	o— 1000000 11000001 10100001

সাধারণত 8 bit এবং 16 bit কম্পিউটারে 7 bit ASCII কোড ব্যবহার করা হয় আর 32 এবং 64 bit মিনি/মেইনফ্রেম (Mainframe) কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় EBCDIC অথবা 8 bit ASCII Code। কোডের পার্থক্যর জন্য যে কোনো কম্পিউটারই অন্য যে কোনো কম্পিউট্রারের সঙ্গে সরাসরি তথ্য আদান প্রদান করতে পারে না। এর জন্য বিশেষ হার্ডওয়্যার সংযোগ ব্যবস্থা (HARDWARE INTERFACE) দরকার হয়।

কিভাবে কম্পিউটারে তথ্য পাঠানো হয়

কম্পিউটারের তথ্য পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইস, যার মধ্যে সব থেকে বেশি ব্যবহারকরা হয় টাইপরাইটারের মতো কী বোর্ড (Key board)।

কী বোর্ডে প্রতিটি চাবি এক একটি অ্যালফানিউমেরিক ক্যারেকটারের জন্য বরাদ্দ করা থাকে। যখনই কোনো চাবি টেপা হয় অমনি কী বোর্ড এনকোডার (Keyboard) Encoder) নামে একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট বুঝে নেয় কোন বোতামটি টেপা হয়েছে আর সেই চাবিটি যে অ্যালফানিউমেরিক ক্যারেকটারের, সেই ক্যারেকটারের ASCII বা EBCDIC কোডটি C P U তে পাঠিয়ে দেয়। যেমন আমরা যদি ASCII কী বোর্ডে A হরফের চাবিটি টিপি, তাহলে কী বোর্ড থেকে পরপর 5,0,0,0,0,0,5 ভোল্টের বিদ্যুৎ স্পন্দন C.P.U তে চলে যায় আর C.P.U বুঝে নেয় তাকে A হরফটি পাঠানো হয়েছে। ঠিক তেমনি কোনো কাজ শেষ করার পর C.P.U যখন আমাদের উত্তর জানাতে চায়, তখন আউটপুট ডিভাইসে (V.D.U, Printer, Plottes ইত্যাদি) উত্তরের ASCII অথবা EBCDIC সংকেত পাঠায়। আউটপুট ডিভাইস গুলিতে থাকে ডিকোডার সার্কিট (Deccder Circuit)। যার কাজ হলো বাইনারি কোডগুলি পড়ে সেই কোডে লিপিবদ্ধ অ্যালফানিউমেরিক ক্যারেকটার গুলি V.D.U তে অথবা কাগজে ছাপিয়ে দেয়। এই ভাবে আমাদের এবং কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। [চলবে]

15/2 রানী শঙ্করী লেন, কল-26

ধাঁধাগুলির উত্তর

(1) 96420×87531

(2) $(3205030)^{13} + (4807545)^{13} = (1602515)^{14}$

(3) $\{3737(213+49)\}^{3} = 958625070836$

(4) $\sqrt{1771} = \sqrt[3]{328509}$

(5) $(43098)^{2} = (2 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 653)^{2}$, সংখ্যাটির 81টি উৎপাদকের সমষ্টি $= (1729)^{3} = (7 \times 13 \times 19)^{3}$

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই অমরনাথ রায়

বর্তমান কালে বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্যুইজ খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে—এমন কি সায়েন্স ক্লাবগুলিতেও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রেডিও এবং টি ভি-তেও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা থাকছে। বাজারে বাংলা এবং ইংরেজীতে বেশ কিছু ক্যুইজ বই বেরিয়েছে। তারমধ্যে সায়েন্স ক্যুইজও আছে।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে মোট সাতাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এই গ্রন্থ পাঠে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে; যেমন—মহাশূন্যে কোন্ বিজ্ঞানী প্রথম অণু আবিষ্কার করেছিলেন? ভারতের কোথায় প্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল? 'সাইবারনেটিক্স্' এর জনক কে? হাইড্রোজেন বোমার জনক কে? বর্ষাতি কি দিয়ে তৈরি হয়? টোমাটো সসে (Sauce) কোন্ অ্যাসিড থাকে? পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব কতো, তা কে প্রথম অনুমান করেছিলেন?—এমনি হাজারো প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে এই গ্রন্থখানি পাঠে।

তিরিশটি চিত্র সম্বলিত 135 পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি পাঠে শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নয়, বিজ্ঞানপিপাসু সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন। গ্রন্থকার বা সংকলক শ্রীসালুই একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞান-লেখক। এই গ্রন্থটি পরিকল্পনায় ও সংকলনে শ্রীসালুই যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, ছাপা এবং অঙ্গসজ্জা অতীব সুন্দর। সংকলক ও প্রকাশক উভয়কেই সাধুবাদ জানাই—এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে।

1000 SCIENCE QUIZ
By Dilip M. Salwi.
Price Rs 20/=, Publisher : Rupa & Co.

মহম্মদ বরজাহান 'উড়োজাহাজের ইতিকথা' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন নারায়ণ সান্যাল। বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মহম্মদ বরজাহান এক নতুন নাম। এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। অনেক পরিশ্রম করে লেখক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তার পরিচয় পাওয়া যাবে দশম পৃষ্ঠার মেঘনাদবধ কাব্যের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃতিতে, পৃষ্ঠা 31 এর ইংরেজী উদ্ধৃতিতে এবং লেখকের কৃতজ্ঞতা স্বীকারে। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের গ্রন্থে সংখ্যা, সংখ্যাগুলি বাংলায় হবে। ইংরেজীতে লেখাই রীতি। লেখক সেই রীতি উল্লঙ্ঘন করেছেন গোটা বইতেই। যেমন 12 পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন রাজা ক্যানিউট (998—1035), 13 পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন দার্শনিক রজার বেকন (1214—1294)। সংখ্যাগুলি ইংরেজীতে লিখলেই ভাল হতো। গোটা বইতে ছাপার ভুল অনেক আছে। চিত্রগুলিও উন্নত মানের নয়। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর বক্তব্য লিখে গেছেন। ছোট-বড় নির্বিশেষে সবারই এ বইটি পড়তে ভাল লাগবে। 'উড়োজাহাজের ইতিকথা' গ্রন্থে আধুনিক কালের উড়োজাহাজের একটি ছবিও নজরে পড়ল না কিন্তু। তবুও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে লেখকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদ মনোরম।

উড়োজাহাজের ইতিকথা।
মহম্মদ বরজাহান।
"সুকান্ত", 14/2, ধর্মতলা লেন, হাওড়া-2
মূল্য : পনের টাকা।

ইদানীং কালে জনপ্রিয় বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় যে সব লেখক ব্যাপৃত আছেন, তাদের মধ্যে সুধাংশু পাত্র অন্যতম। 'মহাসাগরের মহাবিস্ময়' গ্রন্থটি লেখক আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে আছে মহাসাগরের উৎপত্তি রহস্য, সাগরের জলে দ্রবীভূত পদার্থ, মহাসমুদ্রের গভীরতা, সাগরবক্ষে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ, সাগরের রত্নরাজি, সাগরের মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কিছু চিত্র আছে বটে, তবে তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নি—ছাপা হয়েছে বইয়ের গোড়ার দিকে। গ্রন্থের 35 নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে "প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ পড়ে $6\frac{2}{3}$ কিলোগ্রাম।"—ইঞ্চি ও কিলোগ্রাম কি একই শ্রেণীভুক্ত একক? আবার ঐ পৃষ্ঠারও আরেক জায়গায় লেখা আছে "16 বর্গফুট বা 2304 বর্গইঞ্চি"। বর্তমান কালে আমাদের দেশেও যে মেট্রিক পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে, তা লেখকের মনে রাখা উচিত ছিল। পৃষ্ঠা 101 এর দশম লাইনে লেখা হয়েছে 'কডলিভার ওয়েল'। Oil-এর পরিবর্তে তেল লেখা যেতো অথবা 'অয়েল' লেখা উচিত ছিল। ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকা সত্ত্বেও লেখকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ছাপা ও প্রচ্ছদ মনোরম। শুধুমাত্র কিশোর কিশোরীদেরই নয়—সাধারণ মানুষও এই গ্রন্থপাঠে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারবেন।

মহাসাগরের মহাবিস্ময়।
সুধাংশু পাত্র।
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-73
দাম : 15 টাকা।

আকাশের নতুন জ্যোতিষ্ক রাশি

জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আগেকার জ্যোতির্বিদরা জানতেন নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্ক তিন রকমের হতে পারে—গ্রহ, তারা আর নীহারিকা। গ্রহ হচ্ছে ঠাণ্ডা বস্তুপিণ্ড যা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে. এদের নিজস্ব আলো নেই, সবাই সূর্য্যের আলোয় ভাস্বর ; আয়তনে সবচেয়ে ছোট। তারাদের নিজস্ব শক্তির ভাণ্ডার আছে, বিকিরণের ধারাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সূর্যও একটি তারা, আরও ছোট বড় মাপের অনেক তারা দিয়ে গড়া এক একটি তারাজগৎ। নীহারিকা হচ্ছে যেগুলি আবছা মেঘের মত দেখায় ; এগুলি আমাদের তারাজগতের মাঝখানে ছড়ানো পদার্থ ও ধূলিকণার সমষ্টি হতে পারে আবার দূরের অন্য কোনও তারাজগৎও হতে পারে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা এ দুটির ঠিক প্রভেদ ধরতে পারেন নি। দুই ক্ষেত্রেই নীহারিকাগুলির আয়তন তারাদের আয়তনের চেয়ে অনেক অনেক বড়।

খালি চোখে দেখা যায় এমন যে কয়েকটি বিস্তৃত আলোর উৎস নীহারিকা নামে পরিচিত ছিল, তাদের সবগুলিই দূরের তারাজগৎ। এ'দের মধ্যে আছে উত্তর আকাশের অ্যানড্রোমিডা নীহারিকা ও দক্ষিণ আকাশের ম্যাজেলানের মেঘ দুটি। ছায়াপথের মাঝে মাঝে যে সব ধোঁয়াটে মেঘের মত দেখা যায়, সেগুলিকে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এগুলি অগুন্তি তারার সমষ্টি। বড় টেলিস্কোপে অ্যান্‌ড্রোমিডা ও ম্যাজেলানের মেঘ দুটির দৃশ্যও ঐ একই রকম। খালি চোখের ছোট আলোর বিন্দুগুলিকে পৃথক করে দেখার ক্ষমতা কম বলেই, সব মিলিয়ে ওখানটা ঝাপসা মেঘের মত লাগে।

ছায়াপথের স্থানে স্থানে অবশ্য সত্যিকারের নীহারিকা আছে, যা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে পরিষ্কার দেখা যায়। সবচেয়ে কাছের নীহারিকা হল বৃষ তারামণ্ডলের প্লিয়েডিস্ গুচ্ছে (Pleiades Cluster) ; ছোট টেলিস্কোপে দেখা কয়েকটি উজ্জ্বল তারাকে ঘিরে নীহারিকার স্বচ্ছ ওড়না। আরও ভাল দেখা যায় আর একটি প্রোজ্জ্বল গ্যাসের মেঘ কাছাকাছি কালপুরুষ (Orion) তারামণ্ডলে, টেলিস্কোপের দৃশ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মাপের হলেও এটির আসল বিস্তার

ওরিওন নেবুলা

কিন্তু অনেক বেশী ; এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পৌঁছাতে আলোরই সময় লাগবে প্রায় পনের বছর।

সব নীহারিকাগুলিকেই যে উজ্জ্বল হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। এগুলি হচ্ছে বায়বীয় পদার্থ ও মহাশূন্যে ধূলিকণায় মেশানো বিরাট মেঘ। এদের কাছাকাছি যদি উচ্চ তাপমাত্রার তারা থাকে তার আলট্রা ভায়োলেট্ বিকিরণে এর মধ্যে অনুভাস (Flessoroscence) প্রক্রিয়ায় আলোর উৎপত্তি হতে পারে, তারার আলো বিচ্ছুরিত করেও এরা আলোকিত হতে পায়ে ; আবার কখনও কখনও স্থানে স্থানে এক ঘনীভূত অঞ্চল থাকতে পারে, যা বাদল মেঘের মত কালো দেখায়। পিছনের আবছা আলোকিত পটভূমিকায় এগুলির অদ্ভূত অদ্ভূত রূপ দেখা যায়।

ছায়াপথের বাইরে কাছের তারাজগৎগুলিকে টেলিস্কোপে দেখলে এদের মধ্যেকার তারা নীহারিকার ছবি পৃথক করে দেখা সম্ভব, কিন্তু দূরের অনেক তারাজগৎ আছে যেগুলি টেলিস্কোপের ছবিতেও নীহারিকার মত লাগে। তবুও

এদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিচার করে বোঝা যাবে যে এগুলি ধূলি মেশানো বায়বীয় পদার্থের প্রোজ্জ্বল মেঘ নয়, এক একটি সম্পূর্ণ তারাজগৎ যার মধ্যে অসংখ্য তারা ও নীহারিকা রয়েছে। আকার বিচারে এদের মোটামুটি তিন শ্রেণীতে আলাদা করা যায়; এরা আমাদের ছায়াপথ তারা জগতের মত সর্পিলাকৃতি (Spiral) হতে পারে, ডিম্বাকৃতি (Elliptical) হতে পারে, কিংবা একেবারেই আকারহীন (Irregular) হতে পারে। আমাদের কাছাকাছি তারা জগৎদের মধ্যে অ্যান্ড্রোমিডা সর্পিলাকৃতি, আর ম্যাজেলানের মেঘ দুটি আকারহীন। এদের মধ্যে আরও সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগও আছে।

কতকগুলি তারাজগতের কেন্দ্র থেকে বেশীরকম বিকিরণ দেখা যায়। এদের সক্রিয় তারাজগৎ (Active Galaxies) বলা হয়। বৈশিষ্ট্য বিচারে এদের বেশ কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীগুলির নামকরণ সাধারণতঃ আবিষ্কারক বিজ্ঞানীর নামানুসারেই হয়, যেমন, সীফার্ট (Seyfert), সের্সিক্ (Sersic) ইত্যাদি। সক্রিয় তারাজগৎগুলির কেন্দ্র প্রকৃতির কোনও অদ্ভূত প্রক্রিয়া চলছে, যা আমাদের সাধারণ পদার্থবিদ্যার জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না; এ নিয়ে বহু গবেষণা চলছে আজকাল।

মহাবিশ্বের সুদূরপ্রান্তে এই সব তারা জগতের মধ্যে অনেক রকম নতুন ধরনের জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার হয়েছে। বেতার টেলিস্কোপের সূক্ষ্ম নির্দ্দেশের ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যাতে দৃশ্য আলোয় তোলা ছবিগুলির মতই পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাচ্ছে বেতার উৎসগুলির। এদের কতকগুলিকে রেডিও গ্যালাক্সি (Radio Galaxy) বলা হয়। আয়তনে বিরাট, দৃশ্য আলোয় দেখা তারাজগৎগুলির চেয়ে লক্ষগুণ বড়। এদের মধ্যে তারা নীহারিকার ভীড় আছে কিনা তা বুঝাবার উপায় বিজ্ঞানীদের হাতে এখনও আসেনি; কারণ দৃশ্য আলো এত কম যে এদের পরিষ্কার ছবি নেওয়া বর্তমান টেলিস্কোপের ক্ষমতার বাইরে তাই পৃথিবীর কয়েক জায়গায় আরও বড় টেলিস্কোপ বসানোর পরিকল্পনা চলছে। এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ সোভিয়েট রাশিয়ার ছয় মিটার ব্যাসের প্রতিফলকটি, যা ককেসাস্ পাহাড়ে, জেলেন চুক সাহেবের (Zelen chuk skaja) কাছে রয়েছে। শীঘ্রই সাড়ে সাত মিটার ব্যাসের টেলিস্কোপ চালু হবে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। আট মিটার ব্যাসের চারটি আয়নার আলো এক সঙ্গে করে এক বিরাট টেলিস্কোপের পরিকল্পনাও চলছে। তাই দিয়ে এই সব দূরের জ্যোতিষ্কদের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা চলবে।

মহাকাশের এক ধরণের দুর্বোধ্য জ্যোতিষ্ক কোয়েসার (Quasar) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এটি সংক্ষিপ্ত নাম, ইংরাজীতে সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে "Quasi Stallor radio sources", যার অর্থ হচ্ছে যে বেতার উৎসগুলিকে প্রায় তারার মত ছোট বিন্দু রূপে দেখায়। এগুলি থেকে বেতার তরঙ্গের বিকিরণ বেশ জোরে আসে, কিন্তু দৃশ্য আলো নেই বললেই চলে। যেটুকু আসে তাই বিশ্লেষণ করে মনে হয় এগুলি বহু বহু দূরের কোনও অজানা প্রকৃতির জ্যোতিষ্ক, যা হয়ত আদিম মহাবিস্ফোরণের একটু পরেই সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার পরে মহাবিশ্বব্যাপী প্রসারণের ফলে বহু বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। ধারণাটি ঠিক কিনা পরীক্ষা করার নানা রকম চেষ্টা চলছে।

অনন্ত মহাবিশ্বের দূরপ্রান্ত ছেড়ে এবার একটু কাছে আসা যাক। ছায়াপথ তারাজগতের মধ্যেই অনেক কিছু নতুন জিনিষের আবিষ্কার হয়েছে। আমাদের পরিচিত মাপের তুলনায় এগুলি যে খুব কাছে তা বলতে পারব না, কারণ এ সব জায়গা থেকে আমাদের কাছে পৌঁছাতে আলোরও সময় লাগে দশ-বিশ হাজার বছর। আগে শুধু তারা আর নীহারিকার আলোই ধরা যেত, আজকাল গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ বেতার তরঙ্গ পর্যন্ত ব্যবহার করে নানাভাবে এখানকার খবর পাওয়া যাচ্ছে, আর তার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ অবস্থার কথা আমরা জানতে পেরেছি।

পুরাকালের জ্যোতির্বিদ্‌রা ভাবতেন আকাশের তারাগুলি অচল, অনড়; বছরের পর বছর ধরে তাদের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন হয় না। আরও ভাবতেন যে এদের আলোরও কোন পরিবর্তন নেই। মাঝে মাঝে আকাশে দু'একটা নতুন তারা দেখা গেলে খানিকটা জোড়াতালি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে আবার তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এদের একটি হল উত্তর আকাশের পার্‌সিউস (Perseus)। তারামণ্ডলের একটি তারা, যেটি প্রায় তিনদিন অন্তর অন্তর কয়েক ঘণ্টার জন্য প্রায় নিভে যায়। মধ্যযুগের আরব জ্যোতির্বিদরা এটির নাম দিয়েছিলেন আল্‌গল্ (Algol) অর্থাৎ দুষ্ট তারা, যা আকাশের নিয়ম কানুন মানে না। এই রকম ব্যবহারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রথম দেখিয়েছিলেন একটি উনিশ বছরের তরুণ বিজ্ঞানী আজ থেকে দু'শ বছর আগে।

সেই তরুণ বিজ্ঞানীটির নাম জন্ গুড্‌রিক (John Goodricke), তাঁর জন্ম হয়েছিল উত্তর ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তিনি জন্মেছিলেন একটি মারাত্মক শারীরিক খুঁত নিয়ে; কানে শোনা বা কথা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবুও যথেষ্ট লেখাপড়া করেছিলেন, আর সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন তারাদের রহস্য জানবার

উদ্দেশ্যে। আলূগলের দীপ্তি কমা বাড়ার কারণ তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ; আলূগল্ একটি তারা নয়, দুটি তারার সমষ্টি, যা পরস্পরকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। যখন একটি তারা অন্যটিকে আড়ালে করে তখন আমাদের অতি পরিচিত গ্রহণের মত ব্যাপার হয়। তখন এদের সম্মিলিত দীপ্তি কমে যায়। বিজ্ঞানীমহলে ব্যাখ্যাটির মেনে নিতে বহু দিন লেগেছিল ; আজকাল হাজার হাজার গ্রহণরত যুগ্মতারার (Eclipsing Binaries) নানা প্রকৃতির রহস্যের সমাধান করা হয়। দু'শ বছর আগেকার সেই তরুণ বিজ্ঞানীর দেখানো রাস্তা ধরে।

জন্ গুড্‌রিক মাত্র বাইশ বছর বেঁচেছিলেন ; তার মধ্যে আরও এক ধরণের পরিবর্তনশীল তারা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সেফিউস্ (Cepheus) তারামণ্ডলের একটি তারারও নিয়মিত দীপ্তির কমাবাড়া হয়। তবে তার পরিবর্তনের ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। এগুলি সেফিড (Cepheid) জাতীয় তারা বলে পরিচিত। এদের আলোর কমাবাড়ার কারণ গ্রহণ জাতীয় কোনও ঘটনা নয়, তারাদের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্যই তা হয়। কথাটা বুঝতে বিজ্ঞানীদের অবশ্য আরও অনেকদিন লেগেছিল।

তারাগুলি অচল, অনড় এই রকম ধারণার মূলে ছিল, এদের প্রকৃত দূরত্ব বুঝতে না পারা। এরা এত দূরে যে প্রচণ্ড গতিতে চললেও এদের সামান্যতম স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করতে দশ-বিশ বছর লেগে যায়। আগে এত সূক্ষ্ম মাপের ব্যবস্থা ছিল না বলেই ধরা যায় নি। 1838 খৃষ্টাব্দে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী বেসেল (Bessel) প্রথম দেখিয়ে দেন যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর বার্ষিক আবর্তনের ফলে কাছের তারাগুলির স্থানের নিয়মিত পরিবর্তন দেখা যায়। সব তারারই এছাড়া যে নিজস্ব একটা গতি (Proper Motion) আছে সেটাও ধরা পড়ে এই সব সূক্ষ্ম মাপের মধ্য দিয়ে।

এ সব হচ্ছে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ক্রমশঃ উন্নতির বর্ণনা ; এ সবের প্রয়োগে যে তারাদের মধ্যে অদ্ভুত সমস্ত অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তার খানিকটা আভাষ দিচ্ছি। আমাদের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের (Sirius) স্থান পরিবর্তনের মাপে দেখা গেল যে এর নিজস্ব গতি স্থির নয়। এটি নিয়মিতভাবে এঁকেবেঁকে চলেছে। এর একটা হ'তে পারে যে এটি একটি যুগ্ম তারার একটি তারা। অন্যটি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দুটি অংশ পরস্পরকে আবর্তন করে চলেছে। গতিবিদ্যার হিসাবে দেখা গেল যে লুব্ধকের এতখানি আঁকা-বাঁকা পথ ব্যাখ্যা করতে গেলে দ্বিতীয় তারাটিও প্রায় সমান ভারী হওয়া প্রয়োজন, অথচ ঐ রকম বড় তারা থাকলে সেটি নজরে পড়বার কথা। খুব ভাল করে খুঁজে দেখা গেল যে প্রত্যাশিত স্থানে একটি ক্ষীণ তারা

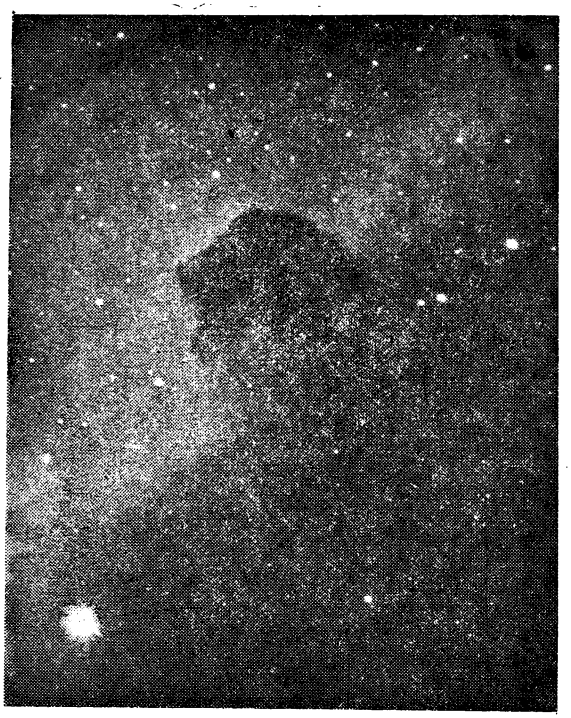

হর্সহেড নেবুলা

রয়েছে যার ঔজ্জ্বল্য অবশ্য নির্ভর করে তারাটির তাপমাত্রার উপরও। কিন্তু বর্ণালী বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেল ক্ষীণ তারাটির তাপমাত্রা লুব্ধকেরই মত। পর্যবেক্ষণের সব তথ্য গুলিকে মেলাতে হলে দাঁড়াবে যে দ্বিতীয় তারাটি লুব্ধকের সমান ভরের হলেও, আয়তনে অনেক ছোট, যার অর্থ হচ্ছে তারাটির পদার্থের ঘনত্ব অকল্পনীয়ভাবে বেশি। হিসাবে দেখা গেল যে এই পদার্থের প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার আয়তনের ভর প্রায় এক লক্ষ গ্রামের কাছাকাছি ; পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী ধাতু অসমিয়াম বা প্ল্যাটিনামের প্রায় পাঁচ হাজার গুণ বেশি।

তারাটিকে শ্রেণীভুক্ত করা হ'ল শ্বেত-বামন (White Dwarf) পর্যায়ে। বামন হ'ল তার ছোট মাপের জন্য আর শ্বেত হ'ল তার বাইরের উচ্চ তাপমাত্রায় বিকীর্ণ উজ্জ্বল সাদা আলোর জন্য। কিন্তু কি রকম করে এত ঘনত্ব সম্ভব ? বিজ্ঞানীরা তারও ব্যাখ্যা দিলেন। পদার্থের গঠন বিচারে দেখা যায় যে তার ভিতরে অণু-পরমাণুগুলির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে। কিন্তু যদি অতি উচ্চ চাপ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এই ফাঁকগুলি কমে আসবে। সাধারণ তারার বেলায় ভিতরকার পরমাণু জোড়া লাগার প্রক্রিয়ায় নির্গত শক্তি তারাটির পদার্থকে ফাঁপিয়ে রাখে। যখন এই প্রক্রিয়া

বন্ধ হয়ে যায়, তখন সমস্ত তারাটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পদার্থের উপর সেই রকম চাপের সৃষ্টি করে, তাইতে এই অবস্থা হ'তে পারে। শ্বেত বামন তারার পদার্থে পরমাণুগুলি সব যেন গায়ে গায়ে লেগে থাকে।

তারপর পরমাণুর গঠন নিয়ে গবেষণার ফলে আরও অনেক নতুন খবর পাওয়া গেল। জানা গেল যে পরমাণুর ভিতরেও যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকে। এদের কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস (Nucleus)—জোড়া লাগা প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি মৌলিক কণিকার সমষ্টি, আর বাইরে রয়েছে ইলেকট্রনের ঝাঁক। যদি চাপ আরও অনেক বেশি বাড়ানো যায়, তখন এই ইলেকট্রনের ঝাঁকও ঢুকে পড়বে নিউক্লিয়াসের মধ্যে। সোভিয়েৎ বিজ্ঞানী ল্যাণ্ডো (Landar) এই তালগোল পাকানো পিণ্ডের নাম দিলেন নিউট্রন পদার্থ (Neutron Matter); এর ঘনত্ব একেবারেই ধারণার বাইরে, প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে কোটি কোটি গ্রাম। এক চামচ পদার্থের ভর হবে দশ কোটি টন।

কিন্তু কি রকমভাবে এই রকম পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে? অ্যামেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রিট্‌জ্‌ জুইকি (Fritz Zwicky) তার একটা উপায় বাৎলে দিলেন। তারাগুলির ভিতরের জ্বালানি ফুরিয়ে আসলে সেগুলি পরিণত হয় শ্বেত বামন তারায়। কিন্তু তারাটির ভর যদি অনেক বেশি হয়, তখন তার অন্তিম পরিণতি হয় একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণে, যার ফলে এর কেন্দ্রের অংশটুকুর উপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হতে পারে, তাইতে নিউট্রন পদার্থের সৃষ্টি হবে। জুইকি এর নামও দিলেন "নিউট্রন তারা"। অতীতে যেখানে যেখানে সুপারনোভা বিস্ফোরণের চিহ্ন রয়েছে, সেইখানে খুঁজলে এইরকম তারা দেখা যেতে পারে।

বহু খোঁজে চলল, কিন্তু নিউট্রন তারার পাত্তা মিলল না। পদার্থবিদ্যার জানা নিয়মগুলি প্রয়োগ করে এগুলির কাল্পনিক ছবি আঁকা হ'ল। দেখা গেল নিউট্রন তারা বেশ জোরে ঘুরবে আর তার চারপাশে ঘিরে থাকবে উচ্চ তাপ মাত্রার প্লাজ্‌মা (Plasma)—ইলেকট্রন-প্রোটনের মেঘ। এখান থেকে সার্চলাইটের মত বিকিরণের রশ্মি বেরিয়ে আসবে। নিউট্রন তারার ঘূর্ণনের সঙ্গে সেই রশ্মিও চারপাশে ঘুরবে; ঘোরার পথে যদি আমাদের পৃথিবীর উপর দিয়ে যায়, ত আমরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বিকিরণের এক এক ঝলক্‌ দেখতে পাব।

অপ্রত্যাশিত ভাবেই দেখা মিলল বিকিরণের এই রকম স্পন্দনের। 1967 খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাণ্টনি হিউইশ্‌ (Anthony Hewish) ও তাঁর ছাত্রী জোস্‌লিন বেল (Jocelyn Bell) আবিষ্কার করলেন স্পন্দনশীল বেতার উৎসের (Pulsating Radio Sources) যা সংক্ষেপে পাল্‌সার (Pulsar) নামে পরিচিত হল। নিউট্রন-তারার বাইরের প্লাজ্‌মা মেঘের প্রত্যাশিত বিকিরণের ধরণের সঙ্গে এর প্রকৃতি পুরোপুরি মিলে গেল। জুইকির ভবিষ্যদ্‌বাণীর তেত্রিশ বছর বাদে দেখা মিলল নিউট্রন তারার; সত্যসত্যই এগুলি পুরানো সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রয়েছে।

কিন্তু নিউট্রন তারাই কি প্রকৃতির সবচেয়ে ঘন বস্তুপিণ্ডের নমুনা? বিজ্ঞানীরা বহুদিন আগেই কল্পনা করেছিলেন তার চেয়ে ঘন পদার্থের; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাসের (Laplace) লেখায় তার প্রথম আভাষ পাওয়া যায়। 1916 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন্‌ তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (General Theory of Relativity) প্রকাশ করলেন, এবং প্রমাণ করলেন যে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে আলোর গতিও ব্যাহত হবে। জুইকির নিউট্রন তারার সম্ভাবনা ব্যক্ত করার পর ধারণা ছিল যে নিউট্রন পদার্থের চেয়ে ঘন বস্তু পিণ্ড আর কিছু হতে পারে না। 1935 খ্রীস্টাব্দে এক ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানী সুব্রহ্মনীয়ম্‌ চন্দ্রশেখর হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে বিরাট তারার অভ্যন্তরে নিউট্রন পদার্থের ঘনত্বও অতিক্রম করে যেতে পারে। তিনি বক্তব্যটি পেশ করেছিলেন লণ্ডনের একটি বিজ্ঞান সভায়, যার জন্য উপস্থিত অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তাঁর এই উদ্ভট কল্পনাকে বিদ্রূপ করেছিলেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা আর জ্যোতির্বিদ্যার নতুন কয়েকটি আবিষ্কার শেষপর্যন্ত তাঁর ধারণাটিকে অভ্রান্ত প্রমাণ করল। দেখা গেল যে একটি তারার নিউট্রন তারার চেয়ে বেশি সংকুচিত হয়ে যাওয়ার পথে মৌলিক কোনও বাধা নেই। এবং সেক্ষেত্রে আরও খানিকটা জোট হলে, সেটি আমাদের সব কিছুর নাগালের বাইরে চলে যাবে। এর উপরে মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্র এত জোরালো হবে যে সেখান থেকে কোনও পদার্থ বা বিকিরণ আসতে পারবে না। ষাটের দশকে অ্যামেরিকান বিজ্ঞানী হুইলার (Wheeler) এটির প্রথম নামকরণ করেন ব্ল্যাকহোল্‌ (Black hole)। এমন এক পরিবেশ যেখান থেকে কোনও খবরই আসবে না—মহাবিশ্বের মধ্যে এক একটি বিরাট শূন্য।

কিন্তু ব্ল্যাকহোল যে আছে সেটা আমরা বুঝব কি করে? তারও উপায় আছে। ব্ল্যাকহোলের মধ্যে যে কি অবস্থা তা বোঝা আমাদের জ্ঞান বা ধারণার বাইরে; কিন্তু এর চারি-দিকে মাধ্যাকর্ষণের জোর ধীরে ধীরে কমে আসে। চারপাশ থেকে পদার্থের স্রোত এর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং ব্ল্যাক-হোলের কাছাকাছি এটি অতি তীব্র গতি আহরণ করছে। পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে এই স্রোত থেকে উচ্চশক্তির বিকিরণ নির্গত হবে; আজকালকার এক্‌স্‌ রশ্মি সন্ধানী উপগ্রহগুলি এই বিকিরণ ধরতে পারবে। বিশেষ করে

[47 পৃষ্ঠায় বাকি অংশ]

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

হোয়াইট ব্লাড করপাসকল, অর্থাৎ শ্বেত কণিকার কাজই হল রোগের জার্ম প্রতিরোধ করা। যখন পারে না তখনই আমরা রোগাক্রান্ত হই।
মেজকা, আমাকে এখুনি বাড়ি যেতে হবে। কাল আমার বিজ্ঞান পরীক্ষা।
বিজ্ঞান! আরে, আমরাও তো বিজ্ঞান নিয়েই চর্চা করছি। বলা যায় না, এ থেকে কোন প্রশ্ন কমোন পেয়ে যেতে পারিস।
তাহলে ডিটেলে শুনে নে— হার্টের সাহায্যে এই রক্ত শিরা উপশিরার দ্বারা প্রবাহিত হয়ে দেহের সর্বত্র অক্সিজেন ও খাদ্য সরবরাহ করে কোষগুলিকে জীবিত রাখে। শুধু তাই নয়, কোষের সব দুষিত পদার্থ শোধন করে আবার হার্টে ফিরে আসে। আবার সেটা হার্টের সাহায্যে—
বুঝেছি! কিন্তু আমাদের রক্তের চ্যাপ্টারটা বাদ আছে মেজকা।
রক্ত ছাড়া কোনো প্রাণীর কথাই চিন্তা করা যায় না, আর তুই বলছিস রক্ত বাদ!
রক্ত একটা ভাইট্যাল উপাদান। তখন পরীক্ষায় থাকুক না থাকুক অন্তত: সংক্ষেপে জেনে রাখা উচিত।
আমারও যে সময় সংক্ষিপ্ত। পড়াও অনেক বাকি। সুতরাং টা-টা।
চটপট কেটে পড়। নয়তো এ আগমার্কা রক্ত পরীক্ষার একটা রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটে যেতে বেশীক্ষণ লাগবে না!
সারা বছর বই-এর পাতা উল্টাবি না— এখন তো সময় সংক্ষিপ্ত হবেই!

খুদের রক্তটা কোন গ্রুপে পড়ে? বুঝতে পারছি না, কেমন ধাঁধাঁ লাগছে!
ইয়াল্লা! রক্তে এসব কি দেখছি!
ও-মাঁ-গো-ও-ও! আমার শিশি থেকে কে সব চুরি করে নিয়ে গেছে!
ওঃ, আবার শুরু হল! ফুটকি, এখন এটা গান গাইবার সময় নয়। দেখছিস একটা গবেষণায় ব্যস্ত আছি।
কে আমার জিনিসে হাত দিয়েছে— জবাব চাই!
তোর জিনিসে কে হাত দিতে যাবে!
তাহলে এ সবের মানে কি? বোতল অর্ধেক হল কি করে?
তোমার সিরিঞ্জে কি এটা? এ-এই তো আমার জিনিস!
উজবুক, ওটা হিউমেন ব্লাড!
কি বোকা তুমি! এ তো স্রেফ আলতা, আমার শিশি থেকে নেওয়া!
মুখ সামলে ফুটকি! এসব বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে তোর ঐ আলতা কুম্‌কুম্‌ নেল পালিশ দিয়ে কাজ চলে না, বুঝলি!

তা তোমার এ অবৈজ্ঞানিক কারবার কবে থেকে চালাচ্ছো শুনি !
কি মুসকিল, বলছি ওটা জলজ্যান্তো খুদের রক্ত। এইমাত্র খুদে দিয়ে গেল।
ঐ বিস্পটে খুদের রক্ত !! ও নিজে ! তোমাকে দিয়েছে ?
তার মানে ! তুই কি বলতে চাইছিস ?
বলতে চাইছি, এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে খুঁজে খুঁজে ওতে কী পদার্থ পেলে শুনি ?
কিস্যু না। খুদের রক্তে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে ! এখুনি একটা ভাল মেডিক্যাল চেক আপ দরকার। নয়তো—
তুমি যখন রক্ত ছেড়ে আলতা নিয়ে পড়েছ, তখনই বুঝেছি চেক-আপ তোমারই দরকার মেজকা !
আবার আলতা !
দেখেও বুঝতে পারছো না, খুদে ফাঁকতালে ফাঁকি দিয়ে সিরিঞ্জে আলতা ভরে দিয়েছে ?
হুম্ !
খুদে—উল্লুক বাঁদর গাধা ! আমাকে ঠকিয়েছে ! শয়তান !
আমি ওকে ছাড়বো না ! ধরতে পারলে ওর গলা টিপে রক্ত নেবো !
হিঃ-হিঃ-হিঃ, মেজকার মাথায় এখন রক্ত উঠে গেছে !

ইলেকট্রনিক্স ক্যুইজ Part-VI বিপ্লব ব্যানার্জী

1. Vacuum tube diode, Silicon diode এবং Germanium diode এই তিনটির কোনটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,—

Type of Diode	Forward Resistance	Backward Resistance
'A'	140 to 160 Ohms	180 Kilo Ohms to 450 Kilo Ohms
'B'	9 Ohms to 15 Ohms	900 Kilo Ohms to 1.2 Mega Ohms
'C'	230 Ohms to 270 Ohms.	9 Mega Ohms to 12 Mega Ohms.

2. ——সালে V = RI সূত্র আবিষ্কার করেন——

3. ধর A একটি তামার তার যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ হইল 100 cms 3 1sq cm। আবার B একটি তামার তার যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ হইল 10 cmq ও 0·1 sq. cm.। তেমনি C একটি তামার তার যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ হইল 1 cm ও 0·01 sq.cm। তাহা হইলে,—

a) A তারের রোধ B অপেক্ষা বেশি। b) B তারের রোধ C অপেক্ষা বেশি। c) A তারের রোধ B ও C তারের রোধের যোগফলের সমষ্টির সমান। d) A, B ও C এই তিনটি তারের রোধ পরস্পর সমান। e) B তারের রোধ C তারের রোধের বর্গের সমান। যদি A তারের রোধাঙ্ক = B তারের রোধাঙ্ক = C তারের রোধাঙ্ক হয়।

4. 0°C তাপমাত্রায় তিন সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং এক মিলিমিটার ব্যাসার্দ্ধ বিশিষ্ট একটি তামার তারের Resistirity এবং Temperature Co-efficient of Resistance যথাক্রমে 1·729 micro ohm·cm 0·00426 হইলে 100°C তাপমাত্রায় উক্ত তারের রোধ হইবে,—

a) 1 ohm, b) 0·24 milli ohm, c) 0·39 milli ohm, d) 24·39 milli ohm. e) 2·439 ohm, f) 1·39 ohm.

5. কোন Capacitor এর Capacitance যে একক দ্বারা প্রকাশ করা হয় তা হল,— a) Coulomb, b) Henry, c) Gauss, d) Weber, e) Oersted, f) Farad.

6. শূন্যস্থান পূর্ণ কর——substance হল উচ্চ রোধযুক্ত এমন এক বস্তু যার মধ্য দিয়ে direct current অপেক্ষা magnetic বা electrostatic lines of force সহজেই অতিক্রম করতে পারে।—

a) Silicon, b) Dielectric, c) Germanium, d) Paramagnetic.

7. 10^{12} Picofarad = ——microfarad = — electrostatic unit of Capacitance.

8. চারটি Capacitors এর Capacitance value হইল যথাক্রমে 2 microfarad, 4 microfarad ও 16 microfarad। এখন ঐ চারটি Capacitors কে series এ সংযুক্ত করিলে যে সম্মিলিত Capacitance হইবে তাহা হইল,—

a) 1 microfarad, b) 30 microfarad, c) 1 microfarad অপেক্ষা যৎসামান্য কিছু বেশি d) 2 microfard ও 3 microfard এর মধ্যে কোন মান

9. প্রত্যেকটি 101 microfard মানের 100টি Capacitors Series এ সংযুক্ত করিলে সম্মিলিত Capacitance কত হইবে?

10. প্রত্যেকটি 0·1 microfarad মানের এক কোটী Capacitors Parallely সংযুক্ত করিলে সম্মিলিত Capacitance কত হইবে?

11. নীচের উত্তরগুলি হইতে উপযুক্ত উত্তরটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

Dielectric Constants of :—	
a) Air——	c) Mica——
b) Oil——	d) Paper——
e) Titanium dioxide —	

উত্তরগুলি যথাক্রমে,—

(f) 88 to 173 (g) 2 to 3 (h) 1 (i) 0·1 to 0·9 (j) 7

12. Volume Unit (VU) is frequently used in — —, so 30 VU = —— watt of power and 3VU = ——watt of power.

13. Loftin-White Amplifier এ যে ধরনের Coupling ব্যবহার করা হয় তা হল,—a) Transformer Coupling, b) Direct Coupling, c) Choke Coupling, d) Capacitor Coupling, e) Resistor Coupling.

14. Frequency response of a Transformer Coupled Amplifier is nonlinear only at,—

a) Lower frequencies, b) Higher frequencies, c) Both at Lower and Higher frequencies.

15. Common Emiter mode এ একটি ট্রানজিস্টারের কালেকটারের signal output ঐ ট্রানজিস্টারের বেসের সাপেক্ষে,—a) 180° out of phase, b) 90° out of phase, c) 270° out of phase d) 0° out of phase.

16. শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

Regenerative বা —— Feedback সাধারণতঃ——সার্কিটে ব্যবহার করা হয়। তেমনি Degenerative বা—Feedback সাধারণতঃ—সার্কিটে ব্যবহার করা হয়।

17. নীচেরগুলি কোনটি কি অর্থ প্রকাশ করে ?

a) FCC, b) CCIR, c) LED, d) LCD, e) CCD.

18. কোনটি টিক ?

Zener diode,—a) Forward bias mode এ কাজ করে, b) Reverse bias mode এ কাজ করে।

19. শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

P-type Semiconductor এ Majority carriers হবে——আর Minority carriers হবে— তেমনি N-type Semiconductor এ Majority carriers হবে——আর Minority carriers হবে——

একটি paper capacitor এর Value "0·1 microfarad, 600V D.C. working" এবং অপর একটি paper capacitor এর value "0·1 microfarad, 400V A.C Working" বলতে কি বুঝ ?

21. একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে 0·1 microfarad, 2 2 kilo volt A.C working nonelectrolytic capacitor প্রয়োজন। কিন্তু তোমার কাছে উহার পরিবর্তে 125 টি 1 microfarad, 400 volt D.C working nonelectrolytic capactior আছে। খরচের দিকে যতদূর সম্ভব নজর রাখিয়া ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কাজ চালাইবার জন্য তোমার এখন কি করণীয় আছে ? [উত্তর 30 পৃষ্ঠায়]

নাক ডাকলে কি করণীয় ?

কমল চক্রবর্তী

আপনি হয়ত ঘুমোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় দেখলেন যে আপনার পাশের লোকটি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকা শুরু করে দিয়েছেন। এই নাক ডাকার জন্য হয়ত আপনি ঘুমুতে পারছেন না অথচ ঐ লোকটিকে যদি জাগিয়ে দেন, দেখবেন তাঁর নাকডাকা বন্ধ হয়ে গেছে। কেন এমনটি হয় তা এবার জানা যাক।

মানুষ সাধারণ অবস্থায় নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করেন। কিন্তু দেখা যায় ঘুমন্ত অবস্থায় কারো কারো ক্ষেত্রে এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা হয় মুখ দিয়ে। যখন একজন মানুষ জেগে থাকেন, তখন তাঁর মুখের ভেতরের তালু থাকে টানটান। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে অনেকের ক্ষেত্রে এই টানটান ভাবটা আর তার থাকে না। এতে বায়ু মুখের ভেতর দিয়ে যাতায়াতের সময় তালুর চামড়া কাঁপিয়ে দেয়। এবং তার ফলে নাক ডাকে। সর্দির জন্য নাকের কাজ যদি বাধা পায়, তখন মুখ দিয়ে নাকের কাজ হয়ে থাকে এবং নাক ডাকে।

এখন নাক ডাকানি বন্ধ করা যায় যদি শোওয়ার ধরনের অভ্যাসটি বদলান যায়। অর্থাৎ যদি কেউ ডান দিকে কাৎ হয়ে ঘুমোন তাঁকে বাঁদিকে কাৎ হয়ে শুতে হবে। বা কেউ যদি উপুড় হয়ে ঘুমোন তবে তাকে চিৎ হয়ে শুতে হবে। তবে এভাবে যে সব সময় নাক ডাকানি বন্ধ করা যাবে তা জোর দিয়ে বলা যায় না। এর জন্য কিছুকাল আগে লস্‌এঞ্জেলসের ডঃ জে ডিউরিট ফক্সের নির্দেশলিপি মেনে দেখা যেতে পারে। ডঃ ফক্স হলেন একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে একধরনের কলার আছে যা গলায় পড়ে ঘুমোলে হাঁ করে ঘুমোন যাবে না এবং তাতে ঐ নাকডাকানি বন্ধ হয়ে যাবে। ঐ কলারটি তাঁরই আবিষ্কৃত। মুখ বন্ধ থাকলে মুখ দিয়ে শ্বাস নেবার আর কোন সুযোগ থাকছে না, ফলে নাকডাকানি বন্ধ হয়ে যাবে। একটি ছোট রাইন স্টোন শোভিত কলার তিনি আবিষ্কার করেছেন, যা ব্যবহার করলে নাকডাকা বন্ধ হয়ে যায়। এই কলারকে মিল্কের কলারও বলে। এই কলার ব্যবহার করলে শুতেও কোন কষ্ট হয় না, শীতের দেশে অনেকে মিল্কের কোট ব্যবহার করেন শোবার সময় এবং তাতেও নাক ডাকা বন্ধ হয়। তবে শুধুমাত্র কলার ব্যবহার করেই নাক ডাকা বন্ধ করা যায় বলে কোট পড়ে ঘুমোবার কোন দরকার নেই।

কালিন্দি হাউসিং এস্টেট, ফ্ল্যাট নং C-39/5, কলি-89

ডায়াবেটি'স

দেবব্রত রায়

[**লেখকের কথা**—ডায়াবেটিস সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিশোর-কিশোরী পাঠক-পাঠিকাদের বোধগম্যতার পরিধির দিকে নজর রেখেই। স্বভাবতঃই এটুকুই সব নয়]

ডায়াবেটি'স (Diabetes)—শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নেই এই মুহূর্তে এমন মানুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে। খোঁজ করলে দেখা যাবে প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের কেউ না কেউ ডায়াবেটিসের রোগী।

ডায়াবেটি'সকে গ্রামের দিকে অনেকে বলে থাকেন 'চিনি রোগ'। খুব সাধারণ কথায় ডায়াবেটিস বলতে বোঝায় প্রচুর পরিমানে প্রস্রাব এবং মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি। এখন প্রশ্ন হ'ল ডায়াবেটিস কেন হয়? উত্তরটা দেবার আগে প্রাসঙ্গিক দু'চার কথা জেনে নিই।

ডায়াবেটিস প্রধানতঃ দু'ধরনের—একটার নাম ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes Insipidus—বহুমূত্র) আরেকটা হল ডায়াবেটি'স মেলাইটাস (Diabetes Mellitus—মধুমেহ। শুধু Diabetes বলতে অবশ্য Diabetes Mellitus কেই বোঝায়।

আমরা প্রতিদিন সরাসরি বা খাদ্যের মধ্য দিয়ে যে জল পান করি তার অনেকটাই ভায়া কিডনী মূত্র হিসেবে বেরিয়ে যায়। এই অবসরে কিডনীর গঠনগত এবং কার্যগত একক নেফ্রনের (Nephron) এর কথাটা একবার স্মরণ করে নেওয়া যাক। এর দুটো অংশ—কাপের মত বাউম্যানস ক্যাপসুলের (Bowman's Capsule) মধ্যে রক্ত জালক গ্লোমেরুলাস (Glomerulus)—যাদের একসঙ্গে বলে রেনাল কর্‌পাস্‌ল্‌ (Renal Corpuscle) এবং (2) প্যাঁচানো নলাকার অংশ রেনাল টিউবিউল (Renal Tubule) এখন এই Renal Corpuscle থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে পরিস্রাবিত হয়ে খানিকটা জলও চলে আসে নলাকার অংশে। এই অংশে জল আবার পুনঃ শোষিত (Reabsorption) হয় প্রধানতঃ দু'ভাবে—প্রথমাংশে (নাম Praximal Convoluted tubule) সংক্ষেপে P C T) নিষ্ক্রিয়ভাবে সোডিয়াম আয়নের সঙ্গে পুনঃশোষিত হয়। সোডিয়াম আয়ন (Na) এখানে সক্রিয়ভাবে (Activcly) পুনঃশোষিত হয়। একে বলে Obligatory water Reabsorption) আর কিছুটা জল পুনঃশোষিত হয় শেষাংশ থেকে যাকে বলে Facultature water Reabsorption এই শেষাংশের পুনঃশোষণে মুখ্যতঃ একটা হরমোন কাজ করে তার নাম Antidiuretic Hormone সংক্ষেপে ADH—এটি বেরোয় পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে। ভাবলে আশ্চর্য লাগে প্রতিদিন একজন সুস্থ সবল মানুষের ক্ষেত্রে সামান্য কম বেশী 170 লিটার জল Renal Tubule এ ঢুকে। এখানে এর সিংহভাগটাই (প্রায় 168·5 লিটার পুনঃ শোষিত হয় আর বাকি 1·5 লিটার মূত্র হিসাবে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

এবারে মনে করা যাক পিটুইটারী গ্রন্থির কোনো গণ্ডগোলের জন্য এই ADH ঠিকমত তৈরী হচ্ছে না বা তৈরী হলেও সেখান থেকে কোনো কারণে বেড়ুতে পারছে না, বা বেরুলেও কিডনীতে পৌঁছাতে পারছে না বা সেখানকার কোনো গণ্ডগোলের জন্য নিজের কাজটা ঠিকমত করতে পারছে না—তাহলে জলেরও পুনঃশোষণ নিয়মমাফিক হবে না। ফলে মূত্রের পরিমাণ বেড়ে যাবে প্রচুর পরিমাণে।

—এই হ'ল মোটামুটি বহুমূত্র রোগ (Diabetes Insepidus)

এবারে আসি Diabetes Mellitus এর কথায়। আমরা দৈনন্দিন যে খাবার খাই তার মধ্যকার কার্বোহাইড্রেট অংশটা জারক রসের (Enzyme) সাহায্যে ক্রমাগত ভেঙে ভেঙে সবশেষে গ্লুকোজে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রে (Small Intestine) গিয়ে এরা শোষিত হয়ে রক্তে গিয়ে মিশে রক্তের সঙ্গে নানা পথ ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে কিডনীতে। ব্যোম্যানস ক্যাপসুলের গ্লোমেরুলাসের দিয়ে যাবার সময় কিছু পরিমাণ গ্লুকোজ জল ইত্যাদির সঙ্গে চলে আসে Renal Tubule এ কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এর সম্পূর্ণটাই বিশেষ পদ্ধতিতে পুনঃশোষিত হয়ে আবার রক্তে গিয়ে মিশে। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় Renal tubule এর কোষআবরণীতে এক ধরনের বাহক পদার্থ থাকে Carrier Substance) গ্লুকোজ এদের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে Epithelial membrane এর অন্যধারে চলে যায় সেখানে গিয়ে গ্লুকোজ আর বাহকগুলোর আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে। গ্লুকোজ চলে যায় সাইটোপ্লাজমে আর বাহক আবার ফিরে এসে একইভাবে আগের মতো কাজে লেগে যায়।—এভাবেই চলতে থাকে গ্লুকোজের পুনঃশোষনের কাজ। ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলেন Shannon নামে একজন শরীর তত্ত্ববিদ 1939 সালে।

তবে গ্লুকোজের এই পুনঃ শোষনেরও একটা সীমা আছে। আমাদের রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় মোটামুটি প্রতি 100ml এ 60—100mg গ্লুকোজ থাকে। এই অবস্থায় যে গ্লুকোজটুকু Renal Tubule এ চলে আসে তার সবটাই পুনঃ শোষিত হতে পারে। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় মূত্রে গ্লুকোজের লেশমাত্র থাকে না। কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে

যদি এর পরিমাণ 180 mg/100ml বেড়ে যায় তাহলে সবটুকু গ্লুকোজের পুনঃশোষিত হওয়া সম্ভব নয়। সেই সময়ে মূত্রে খানিকটা গ্লুকোজ এসে যায়।

—একেই বলে মধুমেহ বা Diabetes Mellitus.

এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন আসতে পারে—রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় কেন? অনেক কারণ আছে তবে তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল ইনসুলিন (Insulin) নামক একটা হরমোনের অপ্রতুলতা। ইনসুলিন হরমোনটি বেরোয় অগ্ন্যাশয় (Pancreas) গ্রন্থির B কোষ থেকে। এই হরমোনটি প্রধানতঃ তিনভাবে কাজ করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমান স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে সাহায্য করে।

(1) প্রথমতঃ গ্লুকোজের জারনের ফলে শক্তি উৎপাদন যে শক্তি আমাদের জৈবনিক প্রক্রিয়ায় কাজে লাগে।

(2) দ্বিতীয়তঃ গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরী করে তা প্রধানতঃ লিভার এবং মাংসপেশীতে সঞ্চিত রাখে।

(3) তৃতীয়তঃ প্রোটিন যাতে গ্লুকোজে পরিণত না পারে—সে ব্যবস্থা করে।

মজার ব্যাপার হলো এই Pancreas এরই L কোষ থেকে বেরোয় গ্লুকাগন (glucagon) নামে আরেকটা হরমোন যার কাজ ঠিক 'ইনসুলিনের উল্টো। প্রথমতঃ এটি ইনসুলিন যে গ্লাইকোজেন তৈরী করে (গ্লুকোজ থেকে) মুখ্যতঃ লিভারে এবং অংশতঃ পেশীতে সঞ্চিত করে রাখে তা' ভেঙে দিয়ে আবার রক্তে গ্লুকোজের পরিমান বাড়িয়ে দেয় glucogenolusis পদ্ধতিতে। দ্বিতীয়তঃ অ-কর্বো-হাইড্রেট পদার্থ থেকে glugluconcogenesis পদ্ধতিতে গ্লুকোজ তৈরী করে রক্তে গ্লুকোজের পরিমান বাড়িয়ে দেয়।

স্বভাবতঃই বোঝা যায় যে যদি কোনো কারণে প্যাংক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন কম উৎসন্ন হয় বা গ্লুকাগন বেশী তৈরী হয় তবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমান বেড়ে যেতেই পারে একে বলে Hyperglycaumea এবং ফলে তা খুবই বেড়ে গিয়ে Renal Tubule এর পুনঃশোষণ ক্ষমতাকে ছাপিয়ে যায় তখন মূত্রে এর উপস্থিতি দেখা যায়। একে বলে Diabetes Mellitus.

অনেক সময় দেখা যায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমান স্বাভাবিকই রয়েছে তবুও মূত্রে গ্লুকোজ এসে গেছে সেক্ষেত্রে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় গণ্ডগোল রয়েছে কিডনীতে।

সবশেষে আমি কোনোরকম রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই বিভিন্ন উপসর্গ দেখে মোটামুটি কিভাবে বোঝা যেতে পারে কারো ডায়াবেটিস্ হয়েছে—

(1) খুব বেশী প্রস্রাব হবে (Polyuria) 2) খুব বেশী জল তেষ্টা পাবে (Polydipsia) 3) খুব বেশী খিদে পাবে (Polyphagia) 4) খুব বেশী বেশী খাওয়া-দাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাবে। 5) সমসময় নিজেকে দুর্বল-দুর্বল মনে হবে।

ইলেকট্রনিক ক্যুইজ Part-VI—এর উত্তর

1. 'C, type diode = Vacuum tube diode
'B' type diode = Silicon diode
'A' type diode = Germanium diode
2. 1827 সালে, George Simon Ohm.

3. (d), 4. (b), 5. (f), 6. (b), 7. [10^6, 9×10^{11}], 8. (c), 9. (1 microfarad), 10 (1 Farad), 11. [(a) (h), (b) (g), (c) (j), (d) (g), (e) (f)]

12. (Audio work, 1'0.0005), 13. (b), 14. (c), 15. (a), 16. (Positive, Oscillator, Negative, Amplifier), 17. [(a) = Federal Communication Committee, (b) = Committee Consultant International Radio, (c) = Light Emitting Diode, (d) = Liquid Crystal Display, (e) = Charge Coupled Device]

18. (b),

19. (Holes Electrons, Electrons, Holes)

20. 0.1 μF, 600 volt D.C working বলতে বোঝায় এমন একটি Capacitor যার Capacitance মান 0·1 microfarad এবং যার প্রান্তদ্বয় 600 Direct current voltage পর্যন্ত ভালভাবে সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। ঠিক তেমনি 0·1 μF, 400 volt A C working বলতে বোঝায় এমন একটি capacitor যার capacitance মান 0·1 microfarad এবং যার প্রান্তদ্বয় 400 A.C volt বা $400\times\sqrt{2}$ অর্থাৎ প্রায় 565 volt D.C পর্যন্ত সহ্য করার ক্ষমতা রাখে এবং উক্ত voltage পর্যন্ত Capacitorটি ভালভাবে কাজ করতে পারে।

প্রশ্নানুসারে 400 volt D.C working is equivalent to $\frac{400}{\sqrt{2}}$ বা প্রায় 283 volt A.C working। এখানে দেখা যাচ্ছে যে 1 μF, 400 volt D.C working এই মানের 10টি capacitors series এ সংযুক্ত করলে মোট capacitance দাঁড়ায় $\frac{1}{10}$ microfarad বা 0.1 μF আর working voltage দাঁড়ায় $283\times10=2.83$ kilo volt A.C working।

∴ উক্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রের প্রয়োজনীয় 0.1 μF, 2.2 kilovolt A C working Capacitor-টির জন্য 125টি capacitors হইতে মাত্র 10টি capacitors Series এ সংযুক্ত করিয়া যে সম্মিলিত capacitorটি উৎপন্ন হইবে তাহা অনায়াসেই 0.1 μF, 2.2 kilovolt A.C working capacitor-এর প্রায় সমান কাজ করিতে পারিবে।

17 যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কলি-31

[সাত]

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কেবিনে শুয়ে শুয়েই দেখতে পেলাম, সবে পুবের আকাশ ফরসা হচ্ছে। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লাম। কাকা ও শংকর কাকী তখনো ঘুমোচ্ছেন অঘোরে। কেবিন ছেড়ে বারান্দায় বেরোতেই দেখলাম, আমাদের জাহাজের সামনেই একটা বড় দ্বীপের বিস্তৃত সমুদ্রতীর। জাহাজটা নোঙর করে দাঁড়িয়ে।

জাহাজের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দেখলাম, দেবর, সুভাষ ও টমাস সকলেই ঘুমোচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, হবেই তো, কাল ওদের সকলেরই বেশ ধকল গেছে।

জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সবুজ দ্বীপের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সামনে একটা খাঁড়ির মতো জায়গা। ডাঙার ভেতর থেকে একটা ছোট নদী সমুদ্রে এসে পড়েছে এখানে। সামনে নিস্তব্ধ বনভূমি, জাহাজ থেকেও পাখিদের কিচির মিচির শোনা যাচ্ছে। এক ঝাঁক সবুজ পায়রা হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো সমুদ্রের দিকে। সবুজ বন ভূমিতে উড়ে বেড়ানো সবুজ পায়রা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আজ কাকাদের এই দ্বীপে নামবার কথা। আমাকে হয়তো সঙ্গে নিতে চাইবেন না, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। ঠিক করলাম, যেভাবেই হোক, সৃজনকাকাকে ম্যানেজ করতে হবে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই জাহাজের সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়ল। সকালের ব্রেকফাস্টে আজ টোস্ট, ওমলেট, জ্যাম আর কফি। খেতে খেতেই কাকাকে বললাম কথাটা, 'কাকা, আজ কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যাব আমি—'

সৃজনকাকা উত্তর দেবার আগেই শংকরকাকা বলে উঠলেন, 'পাগল হয়েছ নাকি! এটা হচ্ছে দক্ষিণ আন্দামানের পশ্চিম দিক। এখানেই তো সেই ভয়ংকর জারোয়াদের বাস।'

'ভয়ংকর হলেও মানুষ তো বটে। তাছাড়া তোমরাও সঙ্গে থাকছ। তোমাদের বুঝি কোন ভয় নেই।'

'মানছি, আমাদেরও বিপদের ঝুঁকি আছে। কিন্তু কাজের জন্যই যেতে হচ্ছে। কিন্তু তার ওপর তোর মতো কেউ থাকলে আরো ঝামেলা।'

'কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তো বন্দুক আর রিভলভার থাকছেই। বন্দুক থাকলে কি আর জারোয়ারা এগোতে সাহস পাবে!'

শেষ পর্যন্ত আমার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে দুজনেই বাধ্য হয়ে সায় দিলেন। তবে ঠিক হলো, দেবরও আমাদের সঙ্গে যাবে। লোকটার সাহস প্রচণ্ড, তাছাড়া জারোয়াদের হালচাল অনেকটাই ওয়াকিবহাল। জাহাজের কাজে আসবার আগে আন্দামানে বুশ পুলিশ ফোর্সে বছর দুই কাজ করেছে। এখানে বুশ পুলিশদের কাজ হলো, জারোয়াদের পাহারা দেওয়া, যাতে ওরা ঝট করে লোকালয়ে এসে কোন ক্ষতি করতে না পারে। জারোয়াদের কিছু কিছু কথাও বুঝতে পারে দেবর।

দাঁড় বেয়ে নৌকো করে আমরা চারজন সমুদ্রতীরে পৌঁছলাম। সৃজনকাকার কাছে ম্যাপ, হাতুড়ি আর ব্রানটন কমপাস। সঙ্গে রিভলভার নেন নি কারণ শংকরকাকা বন্দুক নিয়েছেন। তবে আমার শান্তিনিকেতনী ব্যাগে লুকিয়ে নিয়েছি দোদমা আর চকলেট বোমা আর কাকার লাইটারটা। তাছাড়া দেবরের সঙ্গে রয়েছে একটা ধারালো ছোরা আর টাঙ্গি। সেরকম কোন বিপদ হলে ছোড়া ছুঁড়তে সিদ্ধহস্ত আমাদের দেবর। আর জঙ্গল কাটবার কাজে লাগবে টাঙ্গি।

সমুদ্রপারের বালি পেরিয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম আমরা। ঢুকবার আগে চারিদিকের জায়গাটা একবার ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল দেবর। না, জারোয়াদের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

সৃজনকাকা পাথরের স্যামপেল পরীক্ষা করছেন লেনস দিয়ে, তারপর নোটবুকে লিখছেন কী সব হিজিবিজি। আর

ম্যাপেও নানা রঙ লাগাচ্ছেন। শংকরকাকাও দুয়েকটা পাথর দেখলেন।

দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিরাট বিরাট গর্জন, প্যাডক, প্যাল্ডানাস আর ধূপ গাছ। আর গাছগুলির সঙ্গে গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে বেতের লতা। স্কুলের হেড স্যারের কাছে যে বেত দেখেছি, তা' যে এইভাবে গাছের পায়ে লুটিয়ে পড়ে থাকে, তা' জানতাম না। এখন সব গাছগাছালি জটে এমন অবস্থা যে জঙ্গল না কেটে এক পাও এগোবার উপায় নেই। এই জঙ্গলে দেবর প্রায় অরণ্যদেবের মতো। ওর হাতের টাঙ্গি বেতের জঙ্গল সাফ করে ফেলছে চোখের নিমেষে। ওর নিজের হাত পা বেতের কাটায় ছড়ে রক্তারক্তি, তবু একটুও মুখবিকৃতি নেই।

ওদিকে সৃজনকাকা খুবই মনোযোগ দিয়ে পাথর পরীক্ষা করে চলেছেন এক নাগাড়ে—প্রকৃতি বিজ্ঞানীর মতো। মাঝে মাঝে কাদার গন্ধও শুঁকে দেখছেন। শংকরকাকা যতটা পারছেন সাহায্য করছেন। তবে শংকরকাকা ও দেবর জারোয়াদের জন্যই সবচেয়ে চিন্তিত। কখন যে কোথা থেকে ওরা হাজির হবে কে জানে।

সৃজনকাকা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইউরেকা, ইউরেকা—'

'কী ব্যাপার?' শংকরকাকা এগিয়ে গেলেন।

'মনে হচ্ছে এখানে পেট্রোলিয়াম বা গ্যাস সামান্য চুঁয়ে চুঁয়ে বেরোচ্ছে—'

সৃজনকাকা পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, 'লাইটার—'

আমি বললাম, 'এই তো—'

কাকা লাইটার জ্বালিয়ে বারকয়েক একটা জায়গার ওপর ঘোরাতেই আগুন জ্বলতে শুরু করল। কাকা ভালো করে জায়গাটা দেখালেন আমাদের। দেখলাম বড়সড় গোলাকার একটা জায়গা কাদা জাতীয় কীসব জিনিসে ভর্তি, তার মধ্যে বৃত্তাকার তেলের রেখা। সেখানেই আগুনটা জ্বলল মিনিট-খানেক, তারপরই অবশ্য নিভে গেল।

ম্যাপের ওপর এই জায়গাটার নিশানা ভাল করে এঁকে নিলেন সৃজনকাকা। এদিকে দেবরও যথারীতি গর্জনগাছের গায়ে আমাদের যাত্রাপথের চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে, যাতে জাহাজে ফেরবার সময় কোন অসুবিধে না হয়।

শংকরকাকা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে বাবা। এ যে দারুণ আবিষ্কার। হিপ হিপ হুররে। থ্রি চিয়ার্স ফর সৃজন বোস।'

প্রায় ছেলে মানুষের মতো লাফালাফি করতে শুরু করলেন শংকরকাকা। বললেন, 'আরে না না। এখানে এত লাফালাফি করবার মতো কোনো ব্যাপার ঘটে নি। ভেতরে কতটা তেল বা গ্যাস আছে, তা তো জানি না। ড্রিলিং না করলে তা' বুঝবারও কোন উপায় নেই। তবে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আমার হিসেব দেখছি ভুল হয় নি।'

কাকা হাতের ম্যাপটা খুলে ফেললেন ফরফর করে। মাটির ওপর বেছানো ম্যাপের ওপর পেনসিল দিয়ে নানা রকম আঁক কষলেন কাকা। নিজের নোটবুকেও খসখস করে কী সব লিখলেন।

'বুঝলি শংকর, আমরা এইরকম জায়গায় তেলের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং পাথরের উত্তর-দক্ষিণ-মুখী অবস্থান থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই তেলের সন্ধান, আমরা আরো উত্তরে পাব, দক্ষিণেও পেতে পারি, কী বলিস?'

'তার মানে, তুই এই দ্বীপের পুরোটাই অর্থাৎ উত্তরপ্রান্ত থেকে দক্ষিণ অবধি পরীক্ষা করে দেখতে চাস। কিন্তু তা' কি সম্ভব?'

'কেন, তুই কি জারোয়াদের জন্য ভয় পাচ্ছিস?' সৃজনকাকার মধ্যে একটা ডোন্ট পরোয়া ভাব।

শংকরকাকা একটু ইতস্তত করে শান্ত গলায় বললেন, 'অনেকটা তাই। বিশেষত জারোয়ারা যখন এখানে থাকে বলে জানাই আছে, তখন এ জায়গাগুলোকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো নয় কি! কী বল দেবর?'

দেবর বলল, 'হাঁ সাব, ঠিকই বলেছেন, জারোয়ারা হচ্ছে জঙ্গলকা দুশমন। জঙ্গলের বাঘকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু জারোয়াদের নয়।'

দেবরের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে ভাবি, এ আবার কীরকম ব্যাপার! জঙ্গলের বাঘকে পর্যন্ত বিশ্বাস করা চলে। কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষকে বিশ্বাস করা চলে না। একথা শুনে সৃজনকাকাও একদম গুম মেরে গেলেন, একটু ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে, তোরা জাহাজে ফিরে যা, আমি একলাই যাচ্ছি।'

'কী যে মাথামুণ্ডু বলিস, তার ঠিক নেই। আমরা সবাই ফিরে যাব জাহাজে, আর তোকে রেখে যাব জারোয়াদের কবলে! কিছু একটা ঘটলে তোর দাদাকে কী জবাবদিহি করব। ঠিক আছে, তোর কথাই রইল, চল তোর কথামতো এগোনো যাক। যা হবে, তা' সকলের একসঙ্গেই হবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল করে আর কী হবে?'

শংকরকাকা নিজের বন্দুকটা বার কয়েক নেড়েচেড়ে দেখে নিলেন ঠিক আছে কিনা। শংকরকাকার কাছ থেকে সায় পেয়ে কাকার উৎসাহ দেখে কে? নতুন উৎসাহে আমাদের আবার বোঝাতে শুরু করলেন কাকা, 'বুঝলি বাদল, এই যে বালিপাথর, এটা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। তাই আমরা যদি নাক বরাবর উত্তরে যাই, তবে আমরা কেবল এই পাথরই পাব। আর এই পাথরের মধ্যেই তো

খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম পাবার সম্ভাবনা। অবশ্য ম্যাপে যা দেখছি, তাতে বেশ বুঝতে পারছি, উত্তরে বেশি-দূর এগোনো যাবে না। কারণ এভাবে মাইল তিনেক গেলেই তো সমুদ্র। কিন্তু সমুদ্র থেকে তো আর তেল—'

কাকার কথা শেষ হবার আগেই আমি উঠলাম, 'কেন, এখন তো আরব সাগরে বম্বে হাই থেকে তেল উঠছে। তুমি জান না!'

কাকা উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় নিস্তরঙ্গ বনভূমির নিস্তব্ধতা ভেদ করে দূর থেকে হালকা অস্পষ্ট কী একটা আওয়াজ যেন ভেসে এলো। আওয়াজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে খুব সাবধানী আর সতর্ক হয়ে উঠল দেবর। আঙুল দিয়ে ইশারা করে আমাদের একপাশে সরে আসবার নির্দেশ দিল। আমরাও কোন প্রতিবাদ না করে নিতান্তই বাধ্য ছেলের মতো সরে গেলাম একপাশে।

দেবরের মতো আমরাও কান পাতলাম। দূরে, অনেক দূরে, কোথায় যেন ঢাকের আওয়াজ হচ্ছে। তারই গম্ভীর

সামনে একটা বিরাট পাথরের চাঁই।

শব্দ ভেসে আসছে এখানে। ডুম ডুম-ডুম।

ফিসফিস করে বলল দেবর, 'জারোয়া—মনে হচ্ছে কাছেপিঠে কোথাও আছে, তবে আমাদের খবর পায় নি এখনো।'

'তবে কী হবে এখন!'

'কী আর হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে এখান থেকে—'

আমরা হিসেব করে দেখলাম, নৌকোর কাছ থেকে প্রায় এক কিলোমিটারের মতো ভিতরে চলে এসেছি। দূরত্ব এমন কিছু বেশি নয়, কিন্তু পথঘাটহীন

দুর্ভেদ্য জঙ্গলেরভেতর দিয়ে ফিরে চলা খুবই কষ্টসাধ্য। তবু বাঁচোয়া, আসবার সময় গাছগুলোর গায়ে টাঙ্গি দিয়ে চিহ্ন রেখে এসেছে দেবর।

গাছের গায়ে কাটা চিহ্ন দেখে খানিকটা রাস্তা ফিরে এসেছি, এমন সময় জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা তীর ছুটে এলো আচমকা। গায়ে লাগতে লাগতে কোনরকমে বেঁচে গেল দেবর। ভয়ে আমরা ছুটতে শুরু করলাম। চাপা গলায় দেবর বলল, 'ছুটবেন না, সামনের পাথরটার আড়ালে চলে আসুন।'

সত্যিই তো, বা'দিকে একটা বিরাট পাথরের চাঁই। চুনাপাথর বা ঐ জাতীয় কিছু হবে। আমরা চারজনে কোনরকমে ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সাদা পাথরটার গায়ে। পাথরটার আড়ালে দাঁড়িয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত। যাক, বিষাক্ত তীরের মুখে হয়তো বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে না।

শংকরকাকা প্রচণ্ড উত্তেজিত গলায় বললেন, 'এবার বল দেবর, কী উপায়! তখন নয় বেঁচে গেলাম, এরপর ?

চিন্তিত মুখে জবাব দিল দেবর, 'একবার যখন জারোয়ারা দেখতে পেয়েছে তখন সহজে ছাড়বে না আমাদের। ক্রমশ দু'পাশ থেকে ঘিরে ফেলবে।'

'তাহলে উপায় ?' কাঁধের ওপর বন্দুকটাকে ঠিক করলেন শংকরকাকা।

পাথরের ফাঁক দিয়ে দূরে জঙ্গলের দিকে তাকালাম। চারিদিক ফাঁকা, কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু পাথরের আড়ালে বসে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, জঙ্গলের ভেতর থেকে কারা যেন আমাদের ওপর নজর রাখছে। কী ভয়ংকর অন্তর্ভেদী সে দৃষ্টি।

জঙ্গলের ভেতর থেকে আবার আগের মতো ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। তবে এ শব্দের ভাষা যেন আগের মতো নয়। অনেক তীক্ষ্ণ, দ্রুত ও নির্মম। ডুডুম···ডুম... ডুডুম...ডুম। আর ক্রমেই সেই বাজনার শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে...যেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে অমোঘ নিয়তির মতো। পাথরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, দূরে কতগুলো মানুষের অবয়ব। দূর থেকে ভালো দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। কালো ছোটোখাটো চেহারা, উলঙ্গ কিছু মানুষ, সঙ্গে তীর-ধনুক, আমাদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছে।

শংকরকাকা এদিকে বন্দুক কাঁধ থেকে নামিয়ে, ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে বললেন, 'ওই তো ওদের দেখা যাচ্ছে, তাহলে ফায়ার করি—'

সৃজনকাকা হাত তুলে বাধা দিলেন, 'প্রথমেই গুলি চালিয়ে লাভ নেই। একটু অপেক্ষা করে বরং দেখা যাক—। তাছাড়া গুলি বেশি নেই। খুব ভেবেচিন্তে খরচ করতে হবে আমাদের—'

পুরো ব্যাপারটার আকস্মিকতায় বেশ নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। ভয়ে হাত পা কাঁপছে, কপালে ঘামের রেখা। কিন্তু তবু এরই মধ্যে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ফিসফিস স্বরে আমি বললাম, 'কয়েকটা আতসবাজি আছে আমার কাছে—' ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা দোদমা আর চকলেট বোমা বের করলাম। কিন্তু শংকরকাকা বা সৃজনকাকা কেউই এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখালেন না, যদিও আমার এই প্ল্যানটা দেবরের খুব ভালো লেগে গেল।

দেবর বলল, 'দারুণ ব্যাপার হবে। গোটা কয়েক দোদমা আর চকলেট বোমা ফাটিয়ে দেখাই যাক না, ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়ায়।'

এই বলে আমার ব্যাগ থেকে গোটা পাঁচেক দোদমা আর চকলেট বোমা নিয়ে আগুন ধরিয়ে ছুড়ে মারল জঙ্গলের দিকে কি আশ্চর্য! দোদমাগুলো কিন্তু একটুও নষ্ট হয় নি। নির্জন স্তব্ধ জঙ্গল কাঁপিয়ে ফাটতে লাগল কানফাটা শব্দে.... বুম...ফট বুম ফট ফট। সেই বিকট আওয়াজে আমাদেরও হৃৎপিণ্ড কাঁপতে থাকে। তারপর সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সমস্ত জঙ্গল জুড়ে তারস্বরে চিৎকার। জারোয়ার দল এরকম কিম্ভূত শব্দের অস্ত্র আগে কখনো দেখে নি, শোনে নি। তারপরই সবাই মিলে জঙ্গলের মধ্যে দে-চম্পট।

এরপর অবশ্য আমরাও আর দেরি করি নি। উর্দ্ধশ্বাসে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে ছুটে কোন রকমে নৌকোয় ফিরেছি। তারপর জাহাজ উঠে নিশ্চিন্ত।

এই ঘটনার পর সকলের কাছেই আমার কদর হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। বিশেষত ছেবরের কাছে। এরপর থেকে ছোট বলে দেবর আর কখনোই অবহেলা করে নি আমাকে।

[চলবে]

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম ২০·০০ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

দৈত্য

সংকর্ষণ রায়

'এই ঘাসবনের মধ্যে পথের কোন চিহ্নই তো নেই—।' কাতর কণ্ঠে ব'লে উঠল আমাদের গাইড্ দৌলত, 'আমার মনে হচ্ছে এই বনকে বনের পশুরাও এড়িয়ে চলে, কাজেই এর মধ্যে ঢোকা ঠিক হবে না।'

'ঠিক হোক বা না হোক, ঢুকতে আমাদের হবেই।' আমার সহকর্মী বন্ধু গোপীন বললে, 'কারণ এই ঘাসবনের মধ্যে না ঢুকলে আমরা সামনের ঐ পাহাড়ে পৌঁছতে পারব না। ঐ পাহাড়ে কয়লার স্তর আছে কিনা পাহাড়টির কাছে না গেলে বুঝতেই পারব না। কাজেই যেতে আমাদের হবেই।'

'যেতে হবে বললেই কি যাওয়া যায় হুজুর!' আরও আরও কাতর হয়ে ওঠে দৌলতের গলার স্বর: 'ঘাসের আড়ালে বড় বড় অনেকগুলো গর্ত আছে, ঘাস এখানে এত ঘন হয়ে গজিয়েছে যে তাদের একটাও চোখে পড়ে না। এই ঘাসের ওপর দিয়ে যাওয়া মানেই গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়া। তা ছাড়া ।

বলতে বলতে কেঁপে ওঠে দৌলতের গলার স্বর।

'তা' ছাড়া কি? চুপ ক'রে আছ কেন, বল। প্রায় ধমকের সুরে ব'লে ওঠে গোপীন।

'তা' ছাড়া এই সব গর্ত সাপের বাসা। এক জোড়া শঙ্খচূড় সাপও এখানে কোথাও ঠাঁই নিয়েছে।

শিউরে উঠলাম আমি। বললাম, চলুন ফিরে যাই ক্যাম্পে। কাল না হয় অন্য দিক থেকে পাহাড়ে পৌঁছবার চেষ্টা করা যাবে।

'অন্য দিকেও ঘাসবন।' দৌলত বললে, চারদিকে ঘাসবন, মাঝখানে পাহাড়। চারদিকেই ঘাসে চাপা আছে গর্ত ও গহ্বর। ঐ পাহাড়ের মায়া ছাড়ুন হুজুর…'

'না'। চাপা দৃঢ়স্বরে গোপীন বললে, 'ঐ পাহাড়ে পৌঁছতেই হবে। নইলে এখানকার যে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র আমরা তৈরি করছি তা অসম্পূর্ণ থাকবে।'

দৌলত মুখ নিচু ক'রে বললে, 'ঐ পাহাড়ের মায়া ছাড়তে না পারলে তো আমাকে ছাড়ুন। গর্তে প'ড়ে গিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে মরতে আমি চাই না।'

দৌলতের মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে গোপীন বললে, 'ঠিক আছে, তুমি ফিরে যাও, তোমার মত ভীতু গাইড্ আমাদের চাই নে।'

কাঁধ থেকে আমাদের পাথরের থলি, জলের বোতল ইত্যাদি নামিয়ে রেখে চলে গেল দৌলত তার গাঁ দুবছোলার দিকে। আমি তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'এটা বোধ হয় ভাল হ'ল না গোপীনদা, গাইড্ বাদ দিয়ে এই গভীর বনের মধ্যে চলাফেরা করা একটুও নিরাপদ নয়।

গোপীন বললে, 'ভয় নেই, নিজের ওপরে ভরসা রাখ। আমাদের সঙ্গে কম্পাস আছে, ম্যাপ আছে, পথ আমরা হারাবো না। এখন চল, এগিয়ে যাই।'

বলে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়াল গোপীন ঘাসবনের প্রান্তে এসে। ঘাসের আচ্ছাদনের ওপরে পা রাখতে ভরসা পায় না সে, কারণ ঘাসের নিচে কি আছে বোঝা যাচ্ছে না। আমি বললাম, 'বুঝতে পারছেন তো গোপীনদা, এই ঘাসের ওপরে পা রাখাটা কি রকম বিপজ্জনক।'

'হুঁ'। গোপীন জবাব দিল।

'দৌলত ঠিকই বলেছিল, এই ঘাসবনের মধ্য দিয়ে হাঁটা সম্ভব নয়।'

আমার কথার ওপরে কোন মন্তব্য করে না গোপীন, ফ্যালফ্যাল করে সে চেয়ে থাকে ঘাসবনের দিকে।

খানিকক্ষণ বাদে আমি বললাম, 'আর এখানে অপেক্ষা ক'রে কি হবে। চলুন ফিরে যাই।'

'তার মানে বিনা যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করতে হবে!' গোপীন ম্লান হেসে বললে, 'এখানকার, কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে, ম্যাপের মধ্যেও গ্যাপ থেকে যাবে।

এ অঞ্চলটি হচ্ছে চিরিমিরি কয়লাক্ষেত্রের পূব দিকের এলাকা। চিরমিরির কয়লাক্ষেত্রে যেসব কয়লার স্তর পাওয়া গিয়েছে তাদের এদিকে প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা। এদিককার পাথরের স্তরগুলো পরীক্ষা ও মানচিত্র বদ্ধ ক'রে আমরা এর প্রসার বোঝার চেষ্টা করছি। ঘাসবনের মাঝখানে ঐ পাহাড়টি পরীক্ষা করা আমাদের এই কাজের দিক থেকে বিবেচনা করলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ পর্যন্ত যখন আমরা পিছিয়ে যেতে উদ্যত হ'লাম তখন ঘটল একটি বিচিত্র ঘটনা। হঠাৎ কেঁপে ওঠে ঘাসবন। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে একটু দূরে ঘাসের আচ্ছাদন স্পন্দিত ক'রে কে যেন এগিয়ে যায়। ঘাসের আড়ালে চাপা পড়েছে পুরোপুরি কিন্তু ঘাসের কাঁপন দেখে বোঝা যাচ্ছে যেন কোন বন্য প্রাণী এগিয়ে যাচ্ছে।

গোপীন রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'দেখেছ সঙ্কর্ষণ, জানোয়ারটা ঐ পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছে। চল ওর পেছনে পেছনে যাই আমরা। ঘাসবনের আড়ালে নিশ্চয়ই এদের পায়ে পায়ে তৈরি পথ আছে যা গর্ত ও গহ্বরগুলোর পাশ কাটিয়ে গিয়েছে।'

সত্যিই তাই। চলতে চলতে এই পথের ছোঁয়া পাই আমাদের পায়ে পায়ে।

গোপীন বললে, 'ঘাসের কাঁপন দেখে মনে হচ্ছে একটা বড় আকারের হরিণ বা সম্বর হবে।

'আমাদের পথ দেখাবার জন্যই যেন যাচ্ছে জানোয়ারটা।' আমি বললাম।

হঠাৎ বেড়ে যায় ঘাসের স্পন্দনের গতি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গতিও বাড়িয়ে দিতে হয়। গোপীন বললে, 'মনে হচ্ছে একে যেন কেউ তাড়া করেছে। এ যদি হরিণ হয়, একে কে তাড়া করতে পারে বল তো?'

'বাঘা বা চিতাবাঘ।' আমি ঢোঁক গিলে জবাব দিলাম, 'কিন্তু আর কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না, ঘাসবনের মধ্যে আর কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'ঘাসবনের মধ্যে না থাক, নিকটেই আছে। তার তাড়া খেয়েই বোধ হয় হরিণটা ঐ পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে ...'

ঠিকই আন্দাজ করেছিল গোপীন। আমরা পাহাড়ে পৌঁছতেই ঘাসবনের মধ্যে আর একটা স্পন্দন জাগে—তা তীরের বেগে এগিয়ে যায় সামনের ঐ স্পন্দনকে লক্ষ্য করে। আমাদের পথপ্রদর্শক হরিণটি ঘাসের সঙ্গে মিলে মিশে এমনি একাকার হয়েছিল যে তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু দেখতে পাই তার অনুসরণকারীকে। ঘাসের আড়ালে হলুদ রঙের স্রোতের ধাবমান একটি চিতাবাঘকে সনাক্ত করি।

আমরা পাহাড়ের পাথর পরীক্ষা শুরু করার আগেই ঘাসবনের মধ্যে দুটি স্পন্দন একাকার হয়ে যায়। হরিণের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘ।

ঘাসবনের মধ্যে দুটি স্পন্দন একাকার হয়ে যেন একটা ঘূর্ণীর আবর্ত সৃষ্টি করে। শিকারী আয়ত্ত করেছে তার শিকারকে। কিন্তু ঘাসের আড়ালে নিঃশব্দে মারা পড়ে হরিণটি শুরু হয় চিতাবাঘের ভোজ।

আমি বললাম, 'হরিণটি তো মারা পড়ল এখন আমরা ফিরব কি করে'?

'যেভাবে এসেছি, সেভাবেই ফিরব।' গোপীন জবাব দিল, 'যে পথে এসেছি, সে পথেই...

'ঘাসে চাপা পড়া সে পথ কি আর পারব আমরা চিনে নিতে?'

'চেষ্টা করতে হবে। পথটা এসেছে একটা পাথরের শিরার ওপর দিয়ে। এই পাহাড়ে যে ডলারাইট ডাইক্‌টি (doleritedyke) দেখা যাচ্ছে, বোধ হয় তার ওপর দিয়েই এসেছি আমরা। ডাইক্‌টা (পাথরের দেয়াল) অনুসরণ করে আমরা ফেরার পথ পেয়ে যাব। সে তো পরের কথা এখন এস আমরা আমাদের কাজ সারি।'

ফেরার ব্যাপারে উদ্বেগের তাড়নায় আমি কাজে মন দিতে পারি নে, কিন্তু গোপীন কাজ করে যায় নিশ্চিন্ত মনে। পাহাড়ের বেলেপাথর ও কাদাপাথরের স্তরের নিচে সে খুঁজে বের করে কয়লার স্তর। তারপর তাদের চিহ্নিত করে মানচিত্রের মধ্যে। কয়লার স্তরের বিন্যাস পরীক্ষা

করতে, করতে সে সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, দেখছ তো সংকর্ষণ, চিরিমিরির কয়লার স্তর এখানে এসে গিয়েছে।

'চিরিমিরির কয়লা এখানে এসে গেলেও আমরা বোধ হয় আর চিরিমিরি যেতে পারব না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম আমি।'

'কি সব যা তা বলছ তার ঠিক নেই!' বিরক্তি মাখানো স্বরে বললে গোপীন, অবশ্যই ফিরে যাব চিরিমিরি। এস ঐ ডলারাইট ডাইক্‌টাকে (doleritedyke) ফলো (follow) করি।

ডলারাইট আগ্নেয় শিলা: বেলেপাথর কাদাপাথরের স্তর বিদীর্ণ করে তা' শিরার (vein) আকারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ঠিক যেন একটা কালো রঙের দেয়াল, তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে একটুও অসুবিধে হয় না। কিন্তু ঘাসবনের কাছে এসেই থমকে দাঁড়াই, কারণ ডলারাইটকে পুরোপুরি চাপা দিয়েছে ঘাসবন। গোপীন মনে করে হরিণটাকে অনুসরণ করে এই ডলারাইট-এর ওপর দিয়েই এসেছি আমরা। কিন্তু এখন হরিণটা নেই, ঘাসবন নিস্পন্দ, পা ফেলে ফেলে ডলারাইটকে সনাক্ত করে পারি না আর এগিয়ে যেতে। ঘাসবনের মধ্যে দৃষ্টি চলে না, ঘাসের ঘন সবুজ আচ্ছাদনের আড়ালে কোথায় আছে, ডলারাইট তা বোঝা সম্ভব নয়। এখানে পদ স্খলন মানেই গর্ত বা গহ্বরের মধ্যে সমাধি।

এবার গোপীনও ভয় পেল। সিগারেট ধরিয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ঘাসবনের দিকে।

হঠাৎ আর্ত স্বরে সে বলে উঠল, কে আছ, উদ্ধার কর আমাদের এখান থেকে।'

গোপীনের আহ্বানের উত্তরেই যেন ঘাসবনটি আবার কেঁপে উঠল।

'কেও!' আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম, 'আর একটা হরিণ নাকি!

'হরিণ নয়, চিতাবাঘ!' গোপীন ফিসফিসিয়ে বললে, 'সেই চিতাবাঘ—তার খাওয়া শেষ হয়েছে...

'কি করে বুঝলেন এটা সেই চিতাবাঘ?'

'তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছিলাম। আমার ডাক শুনেই যেন এল—

ঘাসবনের মধ্যে স্পন্দন এগিয়ে যায়। পাহাড়ের উল্টোদিকে চিরিমিরির অভিমুখেই যাচ্ছে। যে পথে হরিণকে অনুসরণ করে এসেছিলাম, সেই একই পথ ধরে ফিরে যাচ্ছে চিতাবাঘ।

গোপীন ও আমি অনুসরণ করি তাকে পায়ে পায়ে, অনুভব করি একই পথ। হরিণের পায়ে পায়ে এসেছিলাম এখন হরিণের হত্যাকারী চিতাবাঘের পায়ে পায়ে ফিরে চলি...

পি 583 দমদম পার্ক কলিকাতা-55

ছড়া

গুণের ঘাঁটী

মিলন কুমার মুখার্জী

কিশোর বটে,
তবু ঘটে
আছে নানান জ্ঞান।
ধাঁধার জটে
লেখার পটে
করে সে জ্ঞানদান।
দেখতে ভারী
রঙ-বাহারী,
নয়কো মোটেই মোটা।
নেইকো দাঁড়ী,
দিচ্ছে পাড়ি
জ্ঞানের সাগর গোটা।

"বস্তু-কথা,
গাত্র-ব্যথা,
কেন করে ভয়?"
প্রশ্ন যেথা
জবাব সেথা—
তার মধ্যেই রয়।
কি বাবুজী,
ভাবছ বুঝি
খুব সে অহঙ্কারী!
কিন্তু রাজী
ধরতে বাজী—
আলাপী সে ভারী।

ভদ্র ভীষণ,
মহৎ সে জন
করলে কভু ভুল
আস্থা ভাজন,
উদার-মন
করে তা' কবুল।
ভাবছ কথা নয়কো খাঁটী
(লেবুর মধ্যে আমের আঁঠী!)
কথা নিয়েই ঘ্যানরঘ্যান!
ভাবনা তোমার করছি মাটী!
ভাবছ,'কে এই গুণের ঘাঁটী?'

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

কিশোর ক্লাসিকস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০.

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের কাজল ১২.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০.

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শেক্সপীয়ারের গল্প ১০.

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তেপান্তর ২৫.

জগদীশচন্দ্র বসু
অব্যক্ত ১০.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
রোমাঞ্চকর ২৫.

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ঘনাদা বিচিত্রা ২৫.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর অপু ২৫.

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বাঙলার ডাকাত (অখণ্ড) ২৫.

ছড়া ও কবিতা

কেনেথ আণ্ডার সন
শিবানীপল্লীর কালোচিতা ২০.
মানুষ খেকোর বিভীষিকা ১৫.

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খুকুমণির ছড়া ১০.

অন্নদাশঙ্কর রায়
বিন্নিধানের খই ১০.
হট্টমালার দেশে ১০.

কিশোর রচনাবলী

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী ৩০.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০.

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫.

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনা সমগ্র ২৫.

মেঘনাদ সাহা
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২.

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১৫.

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
কিশোর রচনা সঙ্কলন ১৫.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কিশোর গল্প সমগ্র ৩০.

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার
কল্প বিজ্ঞানের গল্প ১৫.

অদ্রীশ বর্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিক্‌শন ১৫.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মেঘনাদ ১০.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নীল মানুষের কাহিনী ১০.

শিশিরকুমার মজুমদার
নাখনাটিয়ার রহস্য

জনপ্রিয় বিজ্ঞান

সমরজিৎ কর
পরমাণু গবেষণায় ভারত ১০.
মহাকাশ গবেষণায় ভারত ১৫.

বিমান বসু
গ্রহ পরিচয় ১০.
নক্ষত্র পরিচয় ১০.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বাংলার গাছপালা ১০.
পশুপাখী কীটপতঙ্গ ১০.
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৮.

সাধন দাশগুপ্ত
আলো আরও আলো ১৫.
রোমাঞ্চকর রসায়ণ ১২.

পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০.

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃথিবীর পরিচয় ১০.

সুধাংশু পাত্র
বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ১০.

জয়ন্ত বসু
পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় ১৫.

এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
বিচিত্র বিজ্ঞান ৮.

জ্ঞানবিজ্ঞানের কোষগ্রন্থ

সমরজিৎ কর সম্পাদিত
স্টুডেন্টস বুক অব নলেজ ৫০.

অমরনাথ রায় সঙ্কলিত
স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া ২৫.

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ : 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-9

আচার্য আর্যভট্ট কৌশিক ভট্টাচার্য

বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মানুষের মনে কতকগুলি অনুসন্ধিৎসা বা কৌতুহলের সৃষ্টি হল। এর মধ্যে প্রথমেই তাদের দৃষ্টি গিয়েছিল সীমাহীন মহাকাশ আর সুজলাসুফলা প্রকৃতির দিকে। আকাশের সূর্য, চন্দ্র বা তারারা কেন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে-এ প্রশ্ন তাদের মনে জাগতে শুরু করল। নানা রঙিন কল্পনা তাদের মনে ভীড় করল। হিন্দুরা ভাবল সূর্যদেব সাতঘোড়ার রথে চেপে পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থিত বিশাল পর্বত সুমেরুকে পরিক্রমা করছেন। সূর্যদেব যদি যান দক্ষিনে তবে ঐ সুমেরু পর্বতের ছায়ায় পৃথিবীর উত্তরে নেমে আসে অন্ধকার আর উত্তরে গেলে দক্ষিণে অন্ধকার। এভাবেই দিন রাত্রির ব্যাখ্যার কথা ভাবা হ'ল। গ্রীকদের মনে হ'ল, গ্রীকদেশই পৃথিবীর কেন্দ্র। আর তার চারপাশে রয়েছে আটলান্টিকের সুবিশাল জলরাশি। সূর্যদেব অ্যাপোলো অশ্ববাহিত রথে রোজই আকাশে ঘুরে বেড়ান। দিনের শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে সূর্যদেব আটলান্টিকের জলে ডুব দিয়ে ক্লান্তিমুক্ত হন।

এ ধরনের কত কষ্টকল্পিত ধারণার আশ্রয়ে পৃথিবীর মানুষ তাদের কৌতুহল নিরসন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। যুগ যুগ ধরে সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় আরোপ বা অন্ধবিশ্বাসের জোরে এ সমস্ত অবৈজ্ঞানিক অসত্যগুলো তাদের মনে এভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে তাদের মনে হত এগুলিই চরম ও পরম সত্য। তাই পঞ্চম শতাব্দীর বিদগ্ধ গাণিতজ্ঞ আর্যভট্ট যখন তাঁর গবেষণালব্ধ চিন্তা "চলা পৃথ্বি স্থিরা ভিমি" অর্থাৎ পৃথিবীই চলছে, সূর্য স্থির এই কথা ভারতের জ্যোর্তিবিদ্‌দের মধ্যে প্রকাশ করলেন তখন তাকে পরিহাস করা হ'ল। বরাহমিহির তাঁর 'পঞ্চসিদ্ধান্ত' গ্রন্থে এই সত্যকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার চেষ্টায় মেতে উঠলেন। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত এবং আর্যভট্ট শিষ্য লল্লও তীব্র সংশয় প্রকাশ করলেন। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একই কথা বলে। কোন সত্য প্রমাণিত হলে বা পরীক্ষাগত ভাবে অভ্রান্ত হলেও তাঁকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ঐ সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানীকে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তাই হাজার বছর পরেও কোপার্নিকাস-গ্যালিলিও যখন ঐ একই কথা বলল তাঁদেরও শাস্তি পেতে হ'ল। একই ধারা আজও বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দীতেও আইনস্টাইনদের ঐ একই দশা ভোগ করতে হয়েছে।

মহর্ষি আর্যভট্টের জন্ম হয়েছিল 476 খ্রীস্টাব্দে পাটনার কাছে কুসুমপুরে। আর্যভট্ট তাঁর মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করেন তার 'আর্যভট্টার' নামক সংকলনে। প্রকাশ কাল—499 খ্রীস্টাব্দ। চার অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থ গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার এক অমূল্য দলিল। ঐ গ্রন্থে তিনিই প্রথম দিন রাত্রি ভেদের কারণ হিসেবে পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা প্রচার করেন—একে তিনি বলেছেন 'ভূভ্রমণবাদ'। বিশেষ কয়েকটি গ্রহের পরিভ্রমণ, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সুনির্দিষ্ট কারণ। পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে এক নূতন যুগকে সূচিত করে। তাই আর্যভট্টকে ভারতীয় 'সিদ্ধান্ত জ্যোতিষশাস্ত্র' বা সায়েন্টিফিক অ্যাস্ট্রোনমির প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

গণিতের ক্ষেত্রেও তাঁর কতকগুলি সিদ্ধান্ত আজও আমাদের বড় প্রয়োজন। যেমন-বৃত্তের পরিধির সাথে ব্যাসের সম্পর্ক। যারা নবম বা দশম শ্রেণীতে পড় তারা নিশ্চয় π বা পাইয়ের কথা জান। এই π হ'ল বৃত্তের পরিধির ও ব্যাসের অনুপাত। আর্যভট্ট এর মান প্রথম নির্ণয় করেন—3·142857 (প্রায়)। তারপর ত্রিকোণীমিতির কথা প্রথম পাওয়া যায় আর্যভট্ট গ্রন্থেই। বর্তমান ত্রিকোণীমিতির যাকে বলে সাইন (Sin)। আর্যভট্ট তাঁকেই বলেছেন জ্যার্ধ। এবং এর মান নির্ণায়ক এক সারণীর গণনা তিনি দেন। বর্গমূল, ঘনমূল নির্ণয়। দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান, সমান্তর শ্রেণীর যোগফল নির্ণয় এ সমস্ত আমাদের আর্যভট্টের অবদান। অথচ আমরা আজকে তাকেই বিদেশী বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে অধ্যয়ন করছি।

গুপ্তযুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাসস্থান কুসুম-পুরেই রচিত হয় তাঁর 121টি শ্লোক সম্বলিত গবেষণাগ্রন্থ 'আর্যভট্টীয়'। গণিত শাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যায় পণ্ডিত এই মহান মানুষটির কথা ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীক-দেশে তাঁকে বলা হয়েছিল 'অদুবেরিয়স্' বা 'অন্দুবেরিয়স্'। আরবীয়গণের কাছে তিনি 'অর্জভর'। সুলতান মামুদের সভায় বিখ্যাত সভাপদ পণ্ডিত অল-বিরুনি আর্যভট্টের কথা তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। সেখানে বারবার আর্যভট্টকে উল্লেখ করা হয়েছে 'কুসুমপুরের আর্যভট্ট' হিসেবে।

আর্যভট্টের বেশ কিছু শিষ্য পরবর্তী কালে প্রাচীন বিজ্ঞানের বিকাশে সযত্ন স্বাক্ষর রেখে যান। হিন্দু জ্যোতিষে টীকাকার হিসাবে প্রথম ভাস্কর ও লল্লর সুখ্যাতি ছিল। আর এক শিষ্য লাটদেবও 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা'র সমালোচনা করেন। আচার্য আর্যভট্টকে পরে 'বৃদ্ধ আর্যভট্ট' বলা হ'ত। অনেকে তাকে 'সর্ব সিদ্ধান্তগুরু' হিসাবেও বন্দনা করেছেন। পুথিপত্র অনুসন্ধান করে দেখা গেছে আর্যভট্ট কথাটি ভুল আসল নাম এই বিরাট মনীষার হ'ল আর্যভট। তবু আর্যভট্ট যেহেতু প্রচলিত বেশী তাই এই শব্দটি ব্যবহৃত হ'ল।

আচার্য আর্যভট্টকে প্রথম আর্যভট্টও বলা হয়ে থাকে।

1/8 গভঃ হাইসিং এস্টেট, সোদপুর, 24 পরগনা (উঃ)।

প্যাপিরাস ছেড়ে পার্চমেণ্ট

কার্তিক ঘোষ

চিঠি লেখা কিম্বা বই ছাপার জন্যে তখনও কাগজের আবিষ্কার হয়নি পৃথিবীতে। অথচ ছবি আঁকার ধারণা দিয়ে মানুষ তো লেখালিখির কাজ শুরু করে দিয়েছে অনেক আগেই। সভ্যতার সিঁড়ি ভেঙে একদিকে মেসোপটেমিয়া আর একদিকে মিসর অনেক উঁচুতে উঠে পড়েছে তখন।

ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিসনদীর মাঝখানে সবে সুমেরিয়রা এসে স্থাপন করেছে নগর। শুরু করেছে চাষবাস। ব্যবসা-বাণিজ্য। লেন দেন আর হিসাব নিকাশ রাখার জন্যে সৃষ্টি করেছে এক লিপির। তীরের মত চেহারা বলেই নাম তার কিউনিফর্ম লিপি। সুমেরিয়রা সেই সব লিপি খোদাই করে কাঠে, নয়ত লেখে নরম কাদার চাকতিতে। তারপর সেই চাকতি রোদে শুকিয়ে আর আগুনে পুড়িয়ে নিলেই কাজ পাকা।

কিন্তু নীল নদের ধারে মিসর। পিরামিড আর মমির জন্যে যার নামডাক। সেই দেশেও ছোট ছোট ছবির মত ধাঁচে যে লিপি—সেই চিত্রলিপির নাম হায়ারো—গ্লিফিক লিপিতেই লেখা হচ্ছে সব কিছু।

নীলনদের জলাভূমিতে জন্মায় লম্বা লম্বা প্যাপিরাস গাছ। মানুষের হাতের কব্জির মতো মোটা। আমাদের দেশে যে নল বা সার গাছ আছে - খানিকটা সেই রকম দেখতে। লম্বা লম্বা সরু সরু পাতা। আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে প্যাপিরাসের পাতাতেই প্রথম দলিল লেখার কাজ চালু হয়েছিল মিশরের রাজ-বাড়িতে।

তা, তাঁদেরই চেষ্টায় সংগ্রহ হয়েছিল হাজার হাজার পুঁথি, কাঠে পাথরে খোদাই করা কত ইতিহাস। হাতে লেখা কত রকম বই। হাজার ছাড়িয়ে সেই সংগ্রহের পরিমাণ যখন লক্ষে পৌঁছাল, তখনই তৈরি হল একটা পাঠাগার। পৃথিবীর ইতিহাসে পঞ্চম টলেমির প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারটিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমনি বিশাল, তেমনি বিখ্যাত। কারো কারো মতে প্রায় সাত লক্ষ বই ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারে।

কিন্তু সম্রাটের সুখের স্বপ্নে, গৌরবের শুভ্রতায় হঠাৎ যেন ছায়া পড়ে চিন্তার। পঞ্চম টলেমির কানে আসে পারগামাম বলে একটা দেশও এবার গড়তে যাচ্ছে মস্ত পাঠাগার। তাদের রাজা দ্বিতীয় ইউমেনিস উঠে পড়ে লেগেছিল মিশরের সঙ্গে। আলেকজান্দ্রিয়ার গৌরবে বুঝি এবার ভাগ বসাবে পারগামাম।

শঙ্কিত সম্রাটের বুদ্ধি খাটাতে বেশি দেরি হল না।

হুকুম দিলেন, পারগামামে প্যাপিরাস বিক্রি বন্ধ করো। দেখা যাক, ইউমেনিসের স্বপ্ন সার্থক হয় কি করে?

সম্রাটের হুকুম বলে কথা। প্যাপিরাসের রফতানি বন্ধ করে দেওয়া হলো পারগামামের সঙ্গে। টলেমির সঙ্গে সেই থেকেই শুরু হলো ইউমেনিসের প্রবল প্রতিযোগিতা। তিনিও হুকুম দিলেন পারগামামের প্রত্যেকটি মানুষকে। বললেন, হ্যাঁ, এখন থেকেই ভুলতে হবে প্যাপিরাসের কথা। অথচ পাঠাগার আমাদেরও চাই। আমরাও লক্ষ লক্ষ বই নিয়ে গড়ে তুলব আমাদের পাঠাগার।

রাজার সঙ্গে প্রজারাও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেদিন। তাই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই একদিন প্রমাণিত হল চামড়াতেও দিব্যি লেখার কাজ চলে। ভালোই লেখা যায়। কারিগরদের কায়দা দেখে ইউমেনিস দারুণ খুশি। দেখতে দেখতে লেখার কাজে চলে এলো চামড়া। তখন থেকেই তার নতুন নাম হলো পার্চমেণ্ট।

তৈরি হত গরু, ভেড়া, ছাগল, বাছুর আর শুয়োরের চামড়া দিয়ে। প্রথমে জলে ভাল করে ধুয়ে কাঠের ফ্রেমে রেখে মেশানো হত চুন আর খড়িমাটি। রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে আবার চেছে ফেলা হত সে সব। চামড়ার নিচেকার কাজটা হয়ে গেলেই তুলে ফেলা হত ওপরের লোম। তারপর চামড়াটা ঘষার কাজ চলত ঝামা দিয়ে। সবশেষে মাখানো হত খড়িমাটির পাউডার তখন কাগজের মত সাদা ধবধবে হয়ে যেত সেই চামড়াটা। কালি দিয়ে তার উপর লিখলে কে আর সহজে ধরতে পারে বলো?

টলেমি আর ইউমেনিসের এই রকম প্রতিযোগিতার ফলেই বলতে পারো পার্চমেণ্ট সৃষ্টি হয়েছিল একদিন। অতীতের কত ইতিহাস, মানুষের সভ্যতার কত অজানা ইতিকথা, লেখা ছিল সেইসব পুঁথিপত্রে। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আক্রমণে আলেকজান্দ্রিয়ার সেই বিখ্যাত পাঠাগার ধ্বংস হয়েছিল একদিন।

কিন্তু পারগামামের ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে আছে এখনো কিছু পার্চমেণ্ট। খুঁজে পাওয়া গেছে যার অস্তিত্ব। ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও মুছে যায় নি যার লেখা। ঘুচে যায়নি গৌরব।

কুড়কুড়ি, পোঃ— তাঁতিশাল, হুগলি।

খেলাধূলার টুকিটাকি

অজয় দাশগুপ্ত

ইলেকট্রিক হিলস্ একজন ক্রিকেটারের নাম ভাবা যায়! এমন অনবদ্য নামটি দিয়েছিল ইংল্যাণ্ডের দর্শকরা একজন নিগ্রো খেলোয়াড়ের মাথায়। এ ব্যাপারটিও চিন্তার বাইরে। সেই খেলোয়াড়ের নাম স্যার লিয়ারি কনস্টানটাইন। কনস্টানটাইন ছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়। তাঁর সময়ে বিশ্বময় এত টেস্ট খেলা ছিল না। ওয়েস্টইণ্ডিজ তখন নবাগত। কিন্তু সূর্যোদয় যেমন বুঝিয়ে দেয় দিনটি কেমন যাবে তেমনি লিয়ারি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভবিষ্যতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নামক দেশটি ক্রিকেট খেলায় কী যুগান্তর নিয়ে আসবে।

ও কথা যাক। কনস্ট্যানটাইনের কথায় আসা যাক। তিনি ক্রিকেট খেলে পয়সা রোজগারের জন্য ইংলণ্ডেই বসবাস করতেন এবং ওগাডকার কাউণ্টি ক্রিকেটে খেলতেন।

যেমন তাঁর বোলিং তেমনি ব্যাটিং। কিন্তু এই দু ব্যাপারের কোনো কিছুর জন্যই তাঁর ওই নাম নয়। অসাধারণ আর অবিশ্বাস্য ফিল্ডিং এর জন্য সবাই তাঁকে বলত 'ইলেকট্রিক হিলস্' চোখের পলকে মাঠের যে কোনো প্রান্ত থেকে ছোঁ মেরে বল কুড়িয়ে তিনি এক টিপে উইকেট ভেঙে দিতেন। ক্রিকেট খেলেই তিনি স্যার উপাধি পান।

এই ঈশ্বরপ্রতিম ক্রিকেটারের সম্মানে একটি খেলার আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে প্রৌঢ় বয়সে তিনিও অংশ নেন। বয়স হয়ে গেছে, আগের সেই গতি নেই, ফিটনেস নেই। তাঁর পাশ দিয়ে অনবরত বাউণ্ডারি হয়ে যাচ্ছে। সকলে ঠাট্টা করছে, দুয়ো দিচ্ছে। কনস্ট্যানটাইনের টনক নড়ল। সত্যিই তো! তাঁর সমস্ত সুনাম রসাতলে যেতে বসেছে। ব্যাটসম্যান আবার তাঁর পাশ দিয়ে চার হাঁকিয়েছেন। রান দিচ্ছেন অবহেলায়। বিদ্যুৎ গতিতে বল যাচ্ছে সীমানয় দিকে। দর্শকরা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দেখল লিয়ারি ছোঁ মেরে বলটি তুলে নিয়েছেন তারপর সেই একটিপে উইকেটে...

চিৎকার উঠল, 'ইলেকট্রিক হিলস্ দ্যাটস ফ্রম ইলেকট্রিক হিলস্....।

সুপার ক্যাট আরেকটি বিখ্যাত নাম। এই নামে ডাকা হত ক্লাইভ লয়েডকে। বেড়াল সাঙ্ঘাতিক শিকারী আমরা জানি। লয়েড ক্রিকেট মাঠে তেমনই এক শিকারী। ক্যাচ তাঁর কাছে গেলে আর রক্ষে নেই। সুপার ক্যাট ঠিক শিকার ধরে নেয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটে সবচেয়ে উচ্চতম খেলোয়াড় ছিলেন জোয়েল গারনার। ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। তিনি যখন দৌড়ে আসতেন বল করতে, মনে হত বিরাট একটা পাখি ডানা মেলে শূন্যে উড়ে আসছে। কাল্পনিক এই দৃশ্যের কথা ভেবে গারনারের নাম দিলেন দর্শকরা বিগবার্ড।

ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ফাস্ট বোলার ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক টাইসন। টাইসন এত জোরে বল করতেন যে মনে হত একটা ঝড় ধেয়ে আসছে। এই ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করেই টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর নাম হয়ে গেল টাইফুন টাইসন। টাইফুন কথার অর্থ ঝড়।

জর্জ হেডলিকে অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান বলে ডাকত। হেডলি ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের বিস্ময়কর ক্রিকেটার। আবির্ভাবেই তিনি রানের রেকর্ড করেছিলেন, যা অবশ্য পরে আমাদের গাভাসকার ভেঙে দিয়েছেন। এই হেডলিকে ব্ল্যাক ব্র্যাড-ম্যানের শিরোপা দেওয়ায় ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ানরা ক্ষেপে লাল। এই নামকরণকে তারা অপমানের সামিল মনে করেন। হেডলি কেন ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান হবেন। তার গায়ের রঙ কালো বলে ঠাট্টা করা। কেন তারা তো ব্র্যাডম্যানকে অনায়াসেই হোয়াইট হেডলি বলতে পারে। অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের এই দাবি অন্যান্য ক্রিকেট দেশ মেনে নেয় নি। আজো জর্জ হেডলি ক্রিকেট দুনিয়ায় ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান নামেই পরিচিত হয়ে আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হেডলির খেলার সময় সংক্ষিপ্ত না হলে হয়তো অনেক রেকর্ডই তাঁর নামে লেখা থাকত।

প্রশ্ন

এখন একটা প্রশ্ন করা যাক। এই কলকাতার ইস্টবেঙ্গল দলে একজন খোঁড়া খেলোয়াড় ছিলেন। যাঁর পায়ে বল পড়লে অব্যর্থ গোল হত। উনি ছিলেন বিদেশী। চিন্তা করে দেখ তো এই খেলোয়াড়ের নাম জান কিনা?

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন-উত্তর

অয়ন মজুমদার ও সৌমেন মজুমদার

প্রশ্ন ঃ (1) ভাইরাস কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ নিউক্লিও প্রোটিন দ্বারা গঠিত অ-কোষীয়, জড় ও জীবের মাঝামাঝি অতি সূক্ষ্মদেহী যে বস্তু উদ্ভিদ, প্রাণী ও ব্যাকটেরিয়ার সজীব কোষের সংস্পর্শে সজীব থাকে কিন্তু সজীব কোষের বাইরে জড়বৎ পড়িয়া থাকে, তাহাকে ভাইরাস বলে।

প্রশ্ন ঃ (2) ভাইরাসের বৈশিষ্টগুলি কি ?

উত্তর ঃ (i) ভাইরাস জড় ও জীবের মধ্যবর্তী পর্যায়ের একমাত্র আণুবীক্ষণিক বস্তু।

(ii) সকল ভাইরাসই বাধ্যতামূলক ভাবে পরজীবি।

(iii) ভাইরাস DNA অথবা RNA দ্বারা গঠিত।

(iv) জীবন্ত পোষক কোষেই কেবল ভাইরাস বংশ-বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

প্রশ্ন ঃ (3) ভাইরাস কে আবিষ্কার করেন ?

উত্তর ঃ 1675 খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী ভ্যান লিউয়েন হোক নামক একজন হল্যাণ্ড বাসী ভাইরাস আবিষ্কার করেন।

প্রশ্ন ঃ (4) ভাইরাস কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ আকৃতি অনুসারে ভাইরাস চার প্রকার—

(i) গোলাকার [যেমন ঃ—পোলিও ভাইরাস]

(ii) ব্যাঙাচি আকার [যেমন ঃ—ব্যাকটেরিওফাজ]

(iii) দন্ডাকার [যেমন ঃ টোবাকোমোজারেক ভাইরাস]

(iv) ইষ্টকাকার [যেমন ঃ—পক্স ভাইরাস]

প্রশ্ন ঃ (5) উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে ভাইরাস ঘটিত কয়েকটি রোগের নাম।

উত্তর ঃ মানবদেহে—(i) মামপস্ [মামপস্ ভাইরাস]

(ii) জলান্তক [রেবিজ ভাইরাস]

(iii) হাম [মিসলস ভাইরাস]

উদ্ভিদ– (i) মোজেইক [টোব্যাকোমোজাইক ভাইরাস T.M.V]

(ii) লিফকাল [টমাটো ভাইরাস]

প্রশ্ন ঃ (6) একটি উপকারী ভাইরাসের নাম কি ?

উত্তর ঃ ব্যাক্টিরিওফাজ কে উপকারী ভাইরাস বলে।

প্রশ্ন ঃ (7) ভাইরাসকে জড় ও জীবের মধ্যবর্তী বলা হয় কেন ?

উত্তর ঃ কারণ—(i) প্রোটোপ্লাজম বিহীন ভিরিয়নই হইল ভাইরাসের গঠতগত একক।

(ii) বহিঃকোষীয় দশা ও অন্তঃকোষীয় দশা, এই দুইদশা ভাইরাসে দেখা যায়।

(iii) বহিঃকোষীয় দশাই ভাইরাসের সম্পূর্ণ জড়ের মত আচরণ বিধি দেখা যায়।

(iv) পোষক কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাসের আচরণ বিধি জীবের মত।

প্রশ্ন ঃ (8) ব্যাকটেরিয়া কাকে বলে ?

উত্তর ঃ সুনির্দিষ্ট কোষপ্রকার বিশিষ্ট আদি নিউক্লিয়াস যুক্ত ক্লোরোফিল বিহীন পরভোজী ক্ষুদ্র এককোষী জীব-গোষ্ঠীকে ব্যাকটেরিয়া বলে।

প্রশ্ন ঃ (9) ব্যাকটেরিয়া কয় প্রকার ও কি কি ?

উত্তর ঃ আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়া তিন ভাগে বিভক্ত।

(i) কক্কাস [যেমন স্ট্রেপ্টোকক্কাস] [গোলাকার]

(ii) ব্যাসিলাস [দণ্ডাকার]

(iii) স্পাইরিলাম [সর্পিলাকার]

জীবন-যাপন পদ্ধতির ভিত্তিতে ব্যাকটেরিয়া চার প্রকার।

(i) মৃতজীবি [মাইক্রোকক্কাস]

(ii) মিথোজীবি, [রাইজোবিয়াম]

(iii) পরজীবি এবং ব্যাধিসৃষ্টিকারী [ব্যাসিলাস টিটানি]

(iv) নাইট্রোজেন বন্ধন সক্ষম ব্যাকটেরিয়া।

প্রশ্ন ঃ (10) কয়েকটি অপকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম কি ?

(i) ভিব্রিও কলেরি [কলেরা রোগ]

(ii) ব্যাসিলাস নিমোনি [নিমোনিয়া]

(iii) ক্লসটিডিয়াম

প্রশ্ন ঃ (11) ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলা হয় কেন ?

উত্তর ঃ (i) উদ্ভিদের ন্যায় ভিটামিন সংশ্লেষ,

(ii) কোষ প্রাচীর সেলুলোজ নির্মিত,

(iii) উদ্ভিদের ন্যায় জনন প্রক্রিয়া,

(iv) ব্যাকটেরিয়া কেবল তরল খাদ্য গ্রহণে সক্ষম।

প্রশ্ন ঃ (12) কয়েকটি উপকারীব্যাকটেরিয়ার নাম বল।

উত্তর ঃ (i) রাইজোবিয়াম [জমির নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে]

(ii) অ্যাজোটোব্যাক্টর [নাইট্রোজেন বন্ধনে সাহায্য করে]

(iii) মাইকোডারমা অ্যাসিটি [ভিনিগার প্রস্তুতি সহায়ক]।

95 রেল পার্ক, পোস্ট রিষড়া, জেলা হুগলি।

যুগের ভিতর যুগ

চিত্রনাট্য – অনিল কর্মকার
ছবি – গৌতম কর্মকার

ইয়াং কি মশাই ঢুলছিলেন---
এই পুঁথিটা রাখুন—আমার জীবন-কাহিনী।
কে জানে, মুখে বলার মতো সময় যদি আর না পাই।
পুঁথি! বাহ, এযে দেখছি পার্চমেন্টের উপর লেখা।
হ্যাঁ, তখন তো কাগজের জন্মই হয়নি। ভেড়ার চামড়াই ছিল একমাত্র ভরসা।
ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ!
প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে আমি পুঁথি খুলে বসলাম---
শহরের মাঝখান দিয়ে চলেছি। মাটির রাস্তা---
এরা কারা? মাথায় জট-পাকানো বড় বড় চুল, বিশ্রি পোষাক---
দূরে হঠাৎ যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো। তার পর এসে পড়লো এক বিরাট মিছিল।
ভঁপ-ভঁপ-ভঁপ
চলো হে, আমাদেরও এর সঙ্গে যেতে হবে।
ভঁপ--ভঁপ--
মিছিল ধীরে ধীরে পাহাড়চূড়ায় এসে পৌঁছলো। সামনে পরিখা, ওপারে দুর্গ।
কে এ লোকটি? কেমন আজগুবি পোষাক

আস্তে আস্তে খুলে গেল দুর্গের দরজা। পরিখার উপর নেমে এলো ঝুলন্ত সেতু।
ঘড়ড়ড়ড়...ক্যাঁ–চ...
দুর্গের ভিতর প্রবেশ করলো সবাই।
জয় রাজা আর্থারের জয়!
আপনি কি এই পাগলা-গারদেই থাকেন, নাকি কোনও রোগীকে দেখতে এসেছেন?
কী বলতে চাও তুমি? জানোনা, আমি রাজার খাস বাবুর্চির সহকারী। তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করবার সময় আমার নেই।
অবশেষে পেয়ে গেলাম একটি রোগা ঝকমকে ছেলেকে...
মশায় কোত্থেকে আসছেন?
এ পোষাক কোথায় পেলেন? কী করা হয় আপনার? কোথায় থাকেন?
ওহ, যেন খই ফুটছে মুখে।
কী নাম তোমার? কবে জন্ম?
নাম- ক্লারেন্স, জন্ম 513 খ্রীষ্টাব্দে...
কী বললে? পাঁচ–শো–তেরো!
হ্যাঁ, তাই তো, 513।
অবাক কান্ড, আমাকে বিদেশী পেয়ে মজা করছো মনে হচ্ছে?
বারে, মজা করতে যাবো কেন?
7

আমরা এখন কোথায় রয়েছি বলতো?
এখন তাহলে কোন্ সাল?
কেন, রাজা আর্থারের দরবারে।
৫২৪, ১৭শে জুন।
ছেলেটা কোনও চাল দিচ্ছে না তো? ভাববার কথা। আজ ১৭শে জুন, ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দ। কিছুদিন আগে একবার গণনা করে দেখেছিলাম - খ্রীষ্টের জন্মের পর থেকে আমার সময়কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ কতোবার হয়েছে। মনে পড়ছে - ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন বেলা ১২টা ৩ মিনিটে পূর্ণগ্রাস হয়েছিল।
অর্থাৎ আমি যদি দৈবক্রমে সেই অতীত যুগেই এসে থাকি তাহলে আর ৪৮ ঘণ্টা পরেই সে গ্রহণ ঘটবে।
আচ্ছা ক্লারেন্স, বলতো - আমি যাঁর সঙ্গে রয়েছি, ইনি কে?
তাও জানেন না? উনি স্যার কে. মহামান্য নাইট।
ওহে চলো, রাজার কাছে যেতে হবে।
কারন?
বাহ, স্যার কে. কী দুর্জয় পরাক্রমে তোমাকে বন্দী করেছেন তার কাহিনী রাজাকে শোনাবেন না? তারপর তোমাকে ছুঁড়ে ফেলা হবে অন্ধকূপে।
অ-ন্ধ-কূ-পে!
নিশ্চয়, যদ্দিন না তোমার আত্মীয়রা প্রচুর মুক্তিপণ দিয়ে তোমায় উদ্ধার করে।
সর্বনাশ! দেরী হলে কী হবে?
মুক্তি পাবার আগেই ওই অন্ধকূপে একদিন টেঁসে যাবে, সবাই যেমন যায়। কেন, তোমার টাকা আসতে কি খুব দেরী হবে?
তা একটু হবে বৈকি। কারণ আমার আত্মীয় বন্ধুদের জন্মাতেই যে এখনো তেরো শবছর লেগে যাবে।
৪

[22 পৃষ্ঠার বাকি অংশ]

যদি কোনও যুগ্মতারার একটি ব্ল্যাকহোলে পরিণত হয়, তখন কাছাকাছি অন্য তারাটি থেকে পদার্থের স্রোত বেশ গভীর হবে। এই রকম একটি উৎস উত্তর আকাশের সিগ্‌নাস্ (Cygnus) তারামণ্ডলের একটি তারা থেকে পাওয়া গেছে। এখানকার এক্‌স্ রশ্মি বিকিরণের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য কোনও জানা উপায়ে সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই অনুমান হয় যে, বিকিরণটি ব্ল্যাকহোলের দিকে ধাবিত পদার্থ স্রোত থেকেই উৎপন্ন।

আপাততঃ এইটিই ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল প্রমাণ।

ছায়াপথ তারাজগতের মধ্যে এই সব অতিঘন পদার্থ ছাড়াও বহু নতুন প্রকৃতির জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার হয়েছে। নিয়মিত পরিবর্তনশীল তারা ত বহুদিন আগে থেকেই জানা ছিল, এমন অনেক তারা দেখা গেছে যাদের দীপ্তির পরিবর্তন কোনও সহজ জানা নিয়ম মেনে চলে না। এদের অনিয়মিত বা বিপর্যয়সূচক পরিবর্তনশীল (Irregular Cataclysmic Variables) তারা নাম দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌রা যে মাঝে মাঝে নবতারা (Nova) দেখতেন, সেগুলি এই শ্রেণীরই চরমরূপ ; এদের রহস্য বুঝতে গিয়ে প্রকৃতির অনেক নতুন প্রক্রিয়ার খবর বিজ্ঞানীর পেয়েছেন।

শুধু পরিণত তারাই নয়, ছায়াপথের নীহারিকাগুলির মধ্যে অনেক রকম জ্যোতিষ্কের খোঁজ পাওয়া গেছে। যা বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। সব তারারই জন্ম হয়েছে বিরাট পদার্থের মেঘের থেকে, স্থানে স্থানে দেখা যায় অপরিণত তারাদের ভীড়। পদার্থের মেঘ সংকুচিত হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও জ্বলতে সুরু করে নি। এদের বীজ-তারা বলা হয় ; অবলোহিত এলাকার বিকিরণের মাপের মধ্য দিয়ে এখানকার ঘটনাবলীর খবর সংগৃহীত হচ্ছে।

মহাকাশের রহস্য ত সব জায়গাতেই রয়েছে ; আমাদের ঘরের কাছেরও ত কত নতুন খবর পাচ্ছি। আমাদের সৌরজগতের তিনটি গ্রহের চারপাশে বলয় দেখা গেছে, তাদের উপগ্রহগুলির পরিষ্কার ছবিতে অনেক নতুন খবর পাওয়া গেছে ; নতুন প্রশ্নও উঠেছে। আমাদের অতি কাছে সূর্যের হেঁয়ালী বেড়েই চলেছে। এর বাইরের তীব্র উজ্জ্বল অংশুমণ্ডলে, চারপাশের ছটামণ্ডলের স্বচ্ছ আবরণে কিংবা গভীর অভ্যন্তরে যে সব প্রক্রিয়া আমরা ভেবেছিলাম ভাল করেই বুঝে গেছি, এখন দেখা যাচ্ছে সেগুলি আরও গভীর ভাবে বিচার করতে হবে। কারণ আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে নতুন করে দেখা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে মনে হচ্ছে, প্রকৃতির আরও অনেক রহস্য আমাদের বুঝতে বাকি রয়েছে।

প্রচ্ছদ চিত্র : সর্পিল তারাজগৎ

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স, ব্যাঙ্গালোর-75

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তার অনেকটা অংশ জুড়েই ছিল পল্লী উন্নয়নের চিন্তা। তাঁর সেই চিন্তার বাস্তব রূপ নেয় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আজ আমরা তাঁর সেই চিন্তাধারার শরিক। গ্রামগুলিতে যদি সভ্যতার আলো না পেঁছিয় তবে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই পল্লী বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা গ্রামের মানুষের সেবায় ব্রতী। ইতিমধ্যে এ রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পেঁছে দেওয়া হয়েছে এবং পর্ষদ সপ্তম যোজনাকালের মধ্যেই পশ্চিমবাংলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পেঁছে দেবার লক্ষ্যে স্থির। প্রসঙ্গতঃ বিগত বছরগুলিতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ায় পল্লী বাংলার কৃষি কুটির শিল্প স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সংযোজনের পরিসংখ্যান বর্দ্ধমান। বিদ্যুতের ছোঁয়ায় শত শতাব্দীর অন্ধকার কেটে নতুন দিনের আবির্ভাবের শুভক্ষণ ত্বরান্বিত করেছে।

পল্লী সংগঠনে

॥ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ॥

C·S B / 102/22.4.88

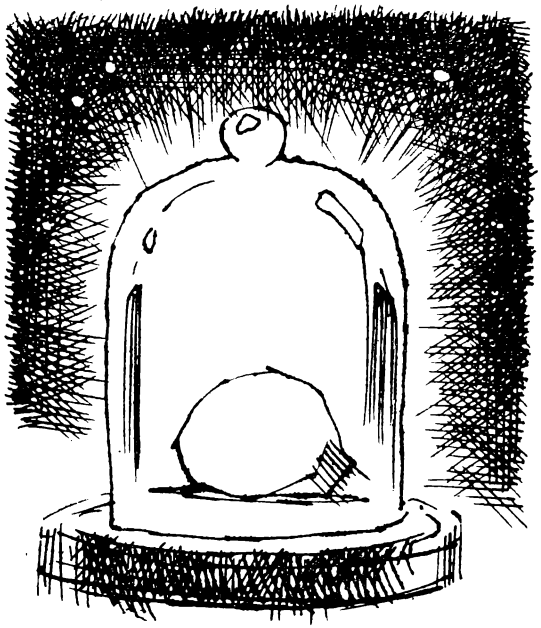

সূর্যদাদুর চকমকি

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

ঘাঃ! একটা অস্পষ্ট কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে সারাটা পাড়া ডুবে গেল নিকষ অন্ধকারে।

সারা ঘরে বিরক্তির ছুঁচো বাজি, মন্তব্যের ফোয়ারা।

অসহ্য!—বাপ্পা বলল।

এসব তুলে দিলেই পারে—জোজোর প্রস্তাব।

কিংবা ঘরে ঘরে গোবর গ্যাসের সাপ্লাই দিক না!—পিকলুর সুচিন্তিত মন্তব্য।

না হে! গম্ভীর ভাবে পল্টু বলে, আবার সেই আদিম যুগে ফিরে যেতে হবে। পেট্রোল আর মাত্র তিন কি চার দশক। কয়লার ভাঁড়ারও চিরকাল নয়। নিউক্লিয়ার পাওয়ার—ফুঃ! ওসব বড় বড় কথা অনেক শোনা হয়েছে। এখন আবার সেই চকমকির যুগে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

হ্যাঁ! এতক্ষণে একটা দামী কথা বলেছেন! চকমকি। একমাত্র চকমকিই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারতো।

সূর্য-দাদুর মন্তব্যে পল্টুর মুখটাও হাঁ হয়ে যায়।

বাপ্পা অবাক হয়ে বলে, চকমকি দিয়েই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়?

কিন্তু জ্বালানীই তো শেষ!—জোজো আপত্তি জানায়।

তাহ'লে চকমকি দিয়ে জ্বলবেটা কি শুনি?—পিকলু বিজ্ঞানীর মত মুখ ক'রে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়।

কেন? ঐ যে বললাম—চকমকি। বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হ'ল না সূর্য দাদুকে।

চকমকিই জ্বলবে?—রীতিমত সন্দিগ্ধ পিকলু।

হ্যাঁ, তা একরকম তাই বলতে পারিস—সূর্য-দাদু তাঁর মোম পালিশ করা মোচে তা দিতে থাকে।

কিন্তু এত চকমকিই বা কোথায় পাওয়া যাবে?—জোজো সরল ভাবেই জানতে চায়।

সূর্য-দাদুকে এবার একটু চিন্তিত মনে হয়। সমস্যাটা তো সেইখানেই। কোথায় যে পাওয়া যায়, সেটাই যে মনে নেই। জায়গাটা খুঁজে পাওয়াও তো সহজ নয়!—চিন্তিত ভাবেই কথাগুলো বললেন তিনি।

তার মানে এমন জায়গা আছে? কিন্তু জায়গাটা মনে নেই? কোথায়? কিভাবে জানলেন? গিয়েছিলেন সেখানে?—এক ঝাঁক প্রশ্নকে থামিয়ে, পিকলু বলল—দাঁড়াও, দাঁড়াও। চুপ করো সবাই। ব্যাপারটা একটু ভাল ভাবে শোনা যাক। সূর্য-দাদু ঘটনাটা একটু খুলে বলুন তো!"

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে রূপোর কৌটো থেকে একটা পান বের ক'রে মুখে দিলেন সূর্য-দাদু। জর্দার মজলিসী গন্ধে ভ'রে উঠল সারা ঘর।

শুনতে চাস?—একটু মুচকে হেসে চোখ বুজলেন সূর্য-দাদু, ওরফে সূর্য রায়।

হ্যাঁ, সেই বিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ এবং কল্প বিজ্ঞানের লেখক সূর্য রায়। তাকে ঘিরেই বসেছিল এই সান্ধ্য আসর।

সূর্য-দাদু শুরু করলেন—

1965-র কোনো এক সময়। সকাল থেকেই প্রচণ্ড গরমে প্রায় ভেপে উঠেছি জাহাজের কেবিনে বসেও। সামুদ্রিক খনিজ অনুসন্ধানের কাজে তখন ঘোরা ফেরা করছি প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্ট ইণ্ডিজ আর তার আশেপাশের কিছু কিছু অঞ্চলে। জাহাজে আরো একজন ভূ-তত্ত্ববিদ ছিলেন— আর্থার নেলসন। বোধ হয় কালা আদমী ব'লেই, সে আমাকে খুব একটা ভাল চোখে দেখত না। তবে আমি তাকে বড় একটা ঘাঁটাই নি।

তো, যে দিনকার কথা বলছিলাম, সেদিন বিকেল নাগাদ ব্যারোমিটারের পারা হঠাৎ ভীষণ নেমে গেল। তার মানে ঝড় আসবে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আমরা গিয়ে ঢুকলাম যে যার কেবিনে। কারণ ঝড়ের সময় ডেকে থাকা নিরাপদ নয়।

ঝড় সত্যিই এলো এবং মারাত্মক ভাবে এলো।

না, আমাদের জাহাজ ডুবে যায়নি। আমাকে কোনো দ্বীপে গিয়েও উঠতে হয় নি। কিন্তু আমরা দিক ভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আর সকাল বেলায় ডেকের ওপর একটা জিনিস পাওয়া গেল। মাঝারি আকারের একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সো। অনুমান করা কঠিন হল না যে, ঝড়ের সময় পর্বত প্রমাণ ঢেউ-এর ধাক্কায় জিনিসটা সমুদ্রে এলো কোথা থেকে? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না।

বাক্সোটা খুলে তার মধ্যে কিছু পোষাক পরিচ্ছদ, একটা দূরবীণ, নাবিকদের সেক্সট্যান্ট যন্ত্র একটা, আর একটা বাইবেল ছাড়াও পাওয়া গেল একটা ডাইরী এবং একটা কাঁচের বয়ামে একটা পাথর। দেখে মনে হ'ল ব্যাসাল্ট জাতীয় পাথর হবে। কিন্তু তাহ'লে এগুলো এত যত্ন ক'রে বয়ামের মধ্যে রাখা হয়েছে কেন? আর্থার অবশ্য প্রশ্নটার ওপর তেমন গুরুত্ব দিল না। তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গী ক'রে বলল, আরে দূর! নাবিকদের কত রকমের কুসংস্কার থাকে। ও সব ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? কিন্তু তবু আমার কৌতূহলটা গেলনা।

সন্ধ্যাবেলায় পাথর আর ডাইরীটা নিয়ে বসলাম। হয়ত কিছুই নয়। লোকটা হয়ত এদু'টো পাথরকে চকমকি হিসাবেই ব্যবহার করত। ঠক্...ঠক্...

একটা লোহার ওপর পাথরটা ঠুকতেই আগুনের ঝলকও দেখতে পেলাম। তাহ'লে চকমকিই। টেবিলের ওপর বয়ামে পাথরটা রেখে, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ডাইরীটা নিয়ে বসলাম। লোকটার নাম ভিকটর আলবিনো। বোধহয় ওলন্দাজ। কারণ ডাইরীর প্রথম কয়েকটা পাতা পুরোপুরি ডাচ ভাষায় লেখা। ডাচ ভাষা আমার জানা নেই, কাজেই কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু পরের দিকে কিছুটা অংশ ইংরেজীতে লেখা রয়েছে দেখে ঝুঁকে পড়লাম। যা লেখা আছে তা প্রায় গল্পের মত। লোকটা 'দাইরেন-মারু' নামে একটা জাপানী জাহাজে সারেং এর কাজ করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাহাজটিকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল এবং এটা প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন জাপানী ঘাঁটিগুলিতে রসদ সরবরাহ করত। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডুবো মাইনের বিস্ফোরণে সাংঘাতিক রকম ঘায়েল হয়ে জাহাজটা ডুবে যায়। প্রায় কেউই বাঁচেনি। একটা লাইফ বোটে চড়ে ভিকটর কোনো রকমে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়। প্রায় সাতদিন সমুদ্রে ভেসে থাকার পর তার নৌকো এসে

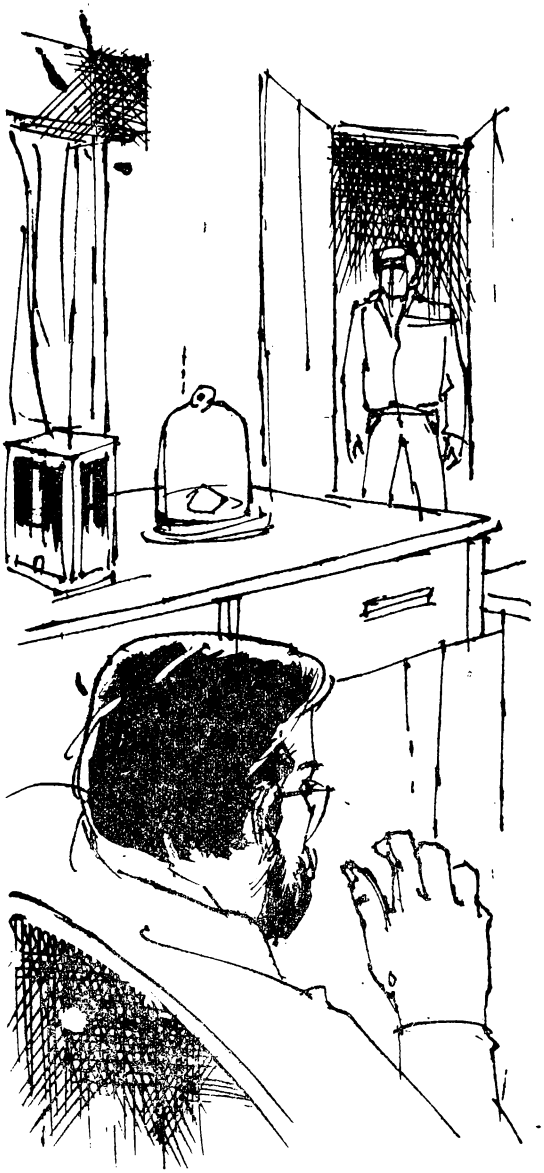

পাশের কেবিন থেকে উঠে এসেছে ভূ-তত্ত্ববিদ আর্থার।

পৌঁছায় পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা একটা ছোট্ট দ্বীপে। দ্বীপটা জনশূন্য নয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দ্বীপবাসীরা নরমাংস ভোজী নয়। আলবিনোর সঙ্গে তারা ভালই ব্যবহার করল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ওরা গোল হয়ে বসে একটা বুনো শূওর রোস্ট করছিল। কিন্তু আলবিনো ভীষণ অবাক হয়েছিল ওদের উনুনটা দেখে। ও কেমন উনুন? এমন অদ্ভুত স্নিগ্ধ হলুদ আলো দিচ্ছে—কিসের আগুন ওটা?...

ব্যস্! ডাইরী এইখানেই শেষ!

মানুষের কৌতূহলের কাছে অসম্পূর্ণ গল্পের মত এমন যন্ত্রনাদায়ক আর বোধ হয় কিছু নেই। সত্যিই, ওটা কিসের আগুন ছিল?

ভাবতে ভাবতে এক সময় হাল ছেড়ে দিলাম। শুয়ে পড়া যাক। টেব্‌ল্ ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলাম—কিন্তু একি! বয়ামের মধ্যে থেকে একটা উজ্জ্বল হলুদ আলো বেরিয়ে এসে ভরিয়ে তুলছে কেবিনের ভেতরটা! দ্রুত এগিয়ে গেলাম বয়ামটার দিকে। হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছিলাম। পাথরটাই হ'ল এই আশ্চর্য আলোর উৎস। বয়ামটা খুলে পাথরটা ধরতেই হাতে প্রায় ছ্যাঁকা লেগে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার! অথচ একটু আগেও ওটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, তখন তো ওটা গরম ছিল না। তাহ'লে এই শক্তি সে পেল কোথা থেকে? শুয়ে শুয়ে আবার আকাশ পাতাল ভাবনা। ঘণ্টা খানেক পরে চোখ মেলে অবাক হয়ে গেলাম। আলোটা প্রায় নিভে এসেছে। দেখা যাচ্ছেনা অন্ততঃ। অন্ধকারে সুইচটা হাতড়ে আবার টেব্‌ল্ ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলাম। বয়ামটা খুলে এখন পাথরটা স্পর্শ করলাম। প্রায় ঠাণ্ডা। ব্যাপারখানা কি? ব্যাপার যাই হ'ক, ঘটনাটা আমার ডাইরীতে লিখে রাখা দরকার। ডাইরীটা খুলে আদ্যপান্ত সব লিখলাম। তারপর টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে—কিন্তু তাজ্জব! টেবিল ল্যাম্পটা নিভতেই বয়ামের ভেতর পাথরটা জ্বলতে শুরু করেছে। তার মানে? আমি চমকে উঠলাম—

তাহ'লে পাথরটা টেবিল ল্যাম্পের আলোর থেকে সমস্ত শক্তিটা সঞ্চয় ক'রে রাখে, আর টেব্‌ল্ ল্যাম্প নেভালে তৎক্ষণাৎ আলোটা বিকিরণ করতে শুরু করে। ঠিক তাই! আর তাহ'লে এমন একটা পাথরকে সারাদিন রোদ্দুরে ফেলে রাখলে সারা রাত আলো আর তাপ পাওয়া যাবে! শক্তি সমস্যা বলে আর কিছুই থাকবে না। পাথর দিয়ে গাড়ি চলবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে...

ইউরেকা!—উত্তেজনায় চিৎকার ক'রে উঠলাম আমি। বোধহয় খুবই জোরে চিৎকার করেছিলাম; কারণ একটু পরেই আমার দরজায় টোকা। পাশের কেবিন থেকে উঠে এসেছে ভূতত্ত্ববিদ আর্থার।

আমি সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললাম তাকে। শুনতে শুনতে ওর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। লুব্ধ দৃষ্টিতে পাথরটার দিকে তাকিয়ে ও বললো—পাথরটার জন্য তুমি কত চাও?

আমি অবাক হয়ে বললাম—তার মানে? এটা কি আমার সম্পত্তি নাকি? বরং আমি আশা করেছিলাম তুমি বিষয়টা নিয়ে একসঙ্গে গবেষণার প্রস্তাব করবে!

না!—কঠোর স্বরে কথাটা উচ্চারণ করল সে। তার হাতে একটা অটোমেটিক কোল্ট পিস্তল।—তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই হে! আমার পিস্তলের তাক বড় একটা ফসকায় না। তবু আরো নিশ্চিত হওয়া ভাল। আজ রাত্রে হাঙরদের একটা ছোট্ট ভোজ সভায় তোমার নেমন্তন্ন একেবারে পাকা।

ও আরো এক পা এগিয়ে আসতেই বিদ্যুৎ বেগে আমার ডান পা-টা গিয়ে আঘাত করল ওর কবজিতে। পরক্ষণেই গুলির শব্দ এবং টেবিলের ওপর একটা চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল সারা কেবিনটা।

আমি ভীষণ অবাক হ'লাম। টেব্‌ল্ ল্যাম্পটা তো জ্বলছিল না। তাহ'লে কি চোখ ধাঁধানো ঐ আলোটা পাথর থেকেই বেরিয়েছিল? গুলিটা কি তবে ঐ পাথরটাতেই লেগেছিল?

অন্ধকারে দ্রুত ধাবমান একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আথারকে অনুসরণের কোনো চেষ্টা করলাম না। আন্দাজে হাত বাড়িয়ে টেব্‌ল্ ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলাম। ঝলমলে আলোয় ভরে গেল টেবিলের ওপরটা। বয়াম চৌচির। পার্থরটা পড়ে আছে এক পাশে। হাতে তুলে নিলাম সেটা। যে কোনো সাধারণ পাথরের মতই ঠাণ্ডা। এছাড়া কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না।

দেখা যাক। আলোটা নিভিয়ে দিতেই কেবিন অন্ধকার হয়ে গেল। বুঝলাম, পাথরটার সেই আশ্চর্যগুণ অন্তর্হিত হয়েছে। বোধহয় গুলিটা গিয়ে সরাসরি পাথরটায় লেগেছিল। তার প্রবল ধাক্কাতেই সম্ভবতঃ শক্তি সঞ্চয় করে রাখার ক্ষমতা পাথরটি হারিয়েছে। ধাক্কা লাগার ফলেই নিশ্চয়ই তার মধ্যে সঞ্চিত আলোটা হঠাৎ নিঃশেষে ছাড়া পেয়েছিল এবং গুলি ছোঁড়ার পরেই যে চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক দেখা গিয়েছিল—এটা তার একটা ব্যাখ্যা হতে পারে।

যাকগে। ঠিক কি যে হয়েছিল, সে তা এখন আর জানার কোনো উপায় নেই। সবটাই অনুমান।

সূর্য দাদু একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরে যেন দীর্ঘশ্বাসের ঝড় উঠল।

সূর্য দাদু সন্দিগ্ধ ভাবে তাকালেন—

কি ঝড় উঠল মনে হচ্ছে?—বিরক্ত ভাবে তিনি প্রশ্ন করলেন।

না, ঝড় নয় রে! ব্যারোমিটারে পারা তো বেশ চড়েই রয়েছে দেখছি।—আড্ডার প্রবীনতম সদস্য বড় দাদুর মন্তব্য।

অ্যানড্রিয়ান ভেসালিয়াস

শংকর ঘটক

জাঁদরেল অধ্যাপক জ্যাকোবাস সিলভিয়াস মানব শরীরের গঠন কাঠামো পড়াচ্ছেন। বিখ্যাত অধ্যাপক তিনি। চারদিকে তাঁর নাম ডাক। দূর দূর থেকে ছাত্ররা আসে তাঁর বক্তৃতা শুনতে। সিলভিয়াস আগে পড়াতেন প্রাচীন সাহিত্য। তাঁর নিজেরও ভাল লাগত এই বিষয়টি। প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়েই তিনি পরিচিত হলেন আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে। বিষয়টি হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞান। মানুষের দেহ গঠন। বহুকাল আগে গ্যালেন নামে এক বিদ্বান মানুষের দেহ গঠন সম্পর্কে অনেকগুলি বই লেখেন। জ্যাকোবাস সিলভিয়াস গ্যালনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইগুলোকে মনে করতেন এক এবং অদ্বিতীয়। পুরোনো, বিবর্ণ এইসব বইগুলো থেকে শব্দের পর শব্দ উচ্চারণ করে যেতেন উদাত্ত কণ্ঠে। অনেকটা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার মতই। আর অনেক দূরে আচ্ছাদিত পচাগলা শবের পাশে বসে থাকত ছুরি হাতে ক্ষৌরকার। অধ্যাপক বক্তৃতা করতে করতে মাঝে মাঝে সংকেত করতেন ক্ষৌরকারের প্রতি। আর ক্ষৌরকার তৎপরতার সঙ্গে কেটে ফেলত একখণ্ড মাংস। তুলে দেখান সমবেত ছাত্রদের। এইভাবেই চলত শিক্ষাদান পর্ব। এইভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করতেন, প্রতিবছর চারশ থেকে পাঁচশ ছাত্র, অধ্যাপক সিলভিয়াসের কাছে।

এমনি একটি ক্লাশে অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন আঠারো বছর বয়সী তরুণ যুবক ছাত্র অ্যানড্রিয়ান ভেসালিয়াস। দিনের পর দিন সেই একঘেয়ে বক্তৃতা। বক্তার সঙ্গে বিষয়ের বিরাট ফারাক। বিবর্ণ পুঁথি থেকে যান্ত্রিক পাঠ—এই কি সত্যিকারের বিজ্ঞান শিক্ষা? এ পরিহাস অসহ্য। ধীর পদক্ষেপে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে গেলেন শবদেহটির পাশে। অদক্ষ ক্ষৌরকারের হাত থেকে ছুরিটি তুলে নিলেন নিজের হাতে। তারপর অধ্যাপকের বক্তৃতার সাথে সাথে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় সম্পূর্ণ দেহটির শবব্যবচ্ছেদ ঘটালেন। সহপাঠী বন্ধুরা সানন্দে অভিনন্দন জানালেন তাঁদের বন্ধুকে।

অধ্যাপক এই যুবকের ধৃষ্টতায় অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। এর সাহস দেখে অবাক হলেন তিনি। তাঁর সেই মুহূর্তে মনে হল ছেলেটিকে অবিলম্বে ক্লাশ থেকে বহিষ্কার করা প্রয়োজন। উদ্ধত এই ছেলেটিকে তাঁর অসহনীয় মনে হল।

(জন্ম : 1514 মৃত্যু : 1564)

কিন্তু বহু কষ্টে তিনি তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করলেন। ভালই ত, ছেলেটি সেই ক্ষৌরকারের থেকে কাজটি ত অনেক ভালভাবেই করেছে। অতএব অযথা নিজের ব্যবসার ক্ষতিকরার প্রয়োজন নেই।

ভেসালিয়াসের সাহায্যেই এরপর থেকে তিনি দেহ গঠনের ক্লাস নিতেন।

*

ভেসালিয়াস হঠাৎই এ রকম দক্ষতা অর্জন করেন নি। এই দক্ষতা অর্জনের পেছনে কাজ করেছে তাঁর পারিবারিক পরিবেশ। তাঁর পিতার উদার শিক্ষাদান। তাঁর মায়ের সংস্কার মুক্ত মন। ভেসালিয়াসের পিতা ছিলেন চিকিৎসক। মা গড়ে তুলেছিলেন মূল্যবান পুস্তকাগার। চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তকের মূল্যবান সংগ্রহ। ভেসালিয়াস কিশোর বয়সেই হাতে তুলে নিয়েছিলেন শল্যবিদের ছুরি—জীবদেহের গঠন

কাঠামো জানার জন্য। ইঁদুর, ব্যাঙ থেকে ছোট বড় অনেক প্রাণীই তাঁর হাতে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে। কিশোরটির গবেষণাগার ছিল তাঁর মায়ের রান্না ঘর। মায়ের রান্নার টেবিল ছিল তাঁর শবব্যবচ্ছেদ টেবিল। বাধা দেয়া দূরের কথা, তাঁর মা তাঁকে এই কাজে নানা ভাবে সক্রিয় সাহায্য করতেন। এমন সংস্কার মুক্ত মন এ যুগেও বিরল।

প্রাথমিক তালিম শেষে চিকিৎসা শাস্ত্রে নিয়মিত পাঠ গ্রহণের জন্য ভেসালিয়াস 1529 খ্রীস্টাব্দে লুভেইন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগ দেন। 1533 খ্রস্টাব্দে চলে যান প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে! সেখানে তিন বছর শিক্ষা গ্রহণের পর ফের চলে আসেন লুভেইন 1536 খ্রীস্টাব্দে। চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যাচেলার ডিগ্রি পান 1537। একই বছরে ডক্টরেট অফ মেডিসিন উপাধিও লাভ করেন।

এই দীর্ঘ শিক্ষা জীবন সম্পর্কে ভেসালিয়াসের চরম তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি এক জায়গায় বলছেন 'এ এক বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা। ক্লাশগুলোয় ক্ষৌরকার শবব্যবচ্ছেদ করে আর অধ্যাপক নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে শেখানো পাখীর মতো গান গেয়ে চলে এমন একটি বিষয়ে যার সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।'

1536 খ্রীস্টাব্দে চরম হতাশা আর মর্মবেদনা নিয়ে ভেসালিয়াস লুভেইনে নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপন করলেন। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহ গঠনের জ্ঞান অর্জনের জন্য শূয়র কুকুর আর ইঁদুর ধরে ধরে শবব্যবচ্ছেদ করে চলছেন।

এমনি সময় আকস্মিকভাবে তিনি পেয়ে গেলেন প্রায় সম্পূর্ণ অটুট একটি মৃতদেহ। কিছু আগেই ফাঁসিকাঠে হত্যা করা হয়েছিল লোকটিকে। আশপাশের আক্রমনোদ্যত শকুনগুলোর চোখে ধূলা দিয়ে অতি সন্তর্পণে নামিয়ে আনলেন মৃতদেহটি। আনন্দে তাঁর বুক ভরে গেল। এই নরকংকালটি পরবর্তীকালে তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল।

এই সময়ে তাঁর খ্যাতি একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শল্য চিকিৎসার অধ্যাপক হিসেবে তিনি কাজে যোগদান করেন। ভেসালিয়াসের জীবনের সব চাইতে কর্মব্যস্ত আর সৃজনশীল সময়ের সূত্রপাত হল এখানে। পাদুয়ার কর্তৃপক্ষের আরেকটি সিদ্ধান্ত ভেসালিয়াসের প্রভূত উপকার করেছিল। কর্তৃপক্ষ আইন করে সমস্ত মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীর মৃতদেহগুলো বিশ্ব-বিদ্যালেয়ের পঠন পাঠনের সুবিধার জন্য সেখানে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন।

ভেসালিয়াসের প্রথমেই আগেকার শিক্ষণ পদ্ধতিকে বাতিল করে নতুন এক পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন যেখানে শিক্ষক-ছাত্রের ব্যবধান উঠে গেল। ছাত্ররা হয়ে গেল শিক্ষকের সহকারী। শিক্ষাদানের প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ভেসালিয়াসের মন অতৃপ্ত। যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন তা সামান্য কটি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করেই থেমে যেতে চান না তিনি। আরো ব্যাপক বিস্তার হওয়া প্রয়োজন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এই জ্ঞানের। ভেসালিয়াসের প্রতিজ্ঞা একটি নতুন দেহ গঠনের বই লিখতেই হবে।

নিরলস পরিশ্রম, প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা আর অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয়ে গড়ে তুললেন বিরাট সৃষ্টি। বিখ্যাত দক্ষ চিত্রকর দিয়ে আঁকান হল নির্ভুল ছবি। 1543 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হল 'দেহ গঠনের ওপর সাতটি গ্রন্হ' বা 'ফেব্রিকা'। অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত যুবকের হাতে যখন মুদ্রিত প্রথম গ্রন্হটি এলো, হয়ত তাঁর চোখ খুশির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল কিংবা তৎক্ষণাৎ পাতা উল্টে খুঁজতে বসেছিল কোথাও কোন ভুল আছে কিনা। সে ইতিহাস লিখে যায় নি কেউ।

পুরাতনপন্থীদের নিষ্ঠুর আক্রমণে ইটালি পরিত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন স্পেনে। রাজা পঞ্চম চার্লস-এর গৃহ চিকিৎসক হলেন। তখন 1544, ভেসালিয়াসের বয়স 30।

*

রাজার গৃহচিকিৎসক হয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছর কাটালেন ভেসালিয়াস। স্পেনে তখন বিজ্ঞানের সাধনা করার সুযোগ ছিল না। বিজ্ঞানের যেকোন রকমের প্রগতিকেই কর্তৃপক্ষ কঠোর হাতে দমন করতেন। শবব্যবচ্ছেদ কল্পনারও অতীত। ভেসালিয়াস বলছেন 'শবব্যবচ্ছেদের ত প্রশ্নই ওঠে না, একটি নরকংকালের মাথার খুলির ওপর হাত রাখার কথা চিন্তা করাই বিপজ্জনক ছিল।' ভেসালিয়াসের প্রচণ্ড কর্মময় জীবনের ছেদ ঘটল। বিরল অনুসন্ধিৎসু মনের ঘটল অপমৃত্যু।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এলো নতুন মুখ, নতুন ভাবনা। ভেসালিয়াসকে তার নিজের দেশের তরুণরা আবার খুঁজে পেলো। ভেসালিয়াসের পদ্ধতিতে শিক্ষাদান পুনপ্রবর্তিত হল। তেসালিয়াসের বই আবার পঠন পাঠন শুরু হল। ভেসালিয়াস পড়ে রইলেন স্বেচ্ছা নির্বাসনের কারাগারে।

1562 খ্রীস্টাব্দে আবার ডাক পড়ল ভেসালিয়াসের। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় আবার তাঁকে চায়। ভেসালিয়াস আনন্দে আত্মহারা। আবার তিনি ফিরে যাবেন নিজের দেশে। আবার তিনি কাজ করবেন নিজের হাতে। অসমাপ্ত কাজটি তিনি তাহলে এবারে শেষ করতে পারবেন। কিন্তু ভেসালিয়াসকে পাদুয়া আর ফিরে পেলো না। শোনা যায় ফেরার পথে সমুদ্রে জাহাজ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। বলেন 1564 সালের জুনে, কেউ বলেন অক্টোবরে।

ছবি সংগ্রহ ঃ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

সংখ্যার ধাঁধা, শঙ্কার নয়

প্রভাতকুমার দত্ত

ধাঁধা যে কত রকমের হয় সেটা জানার চেষ্টা করাই ধাঁধা বিশেষ। শব্দ নিয়ে ধাঁধা হয়, শব্দ মানে Noise নয়, Word। দেশলাই কাঠি দিয়ে যেমন শেষ পর্যন্ত ধোঁয়া সৃষ্টি করা যায় তেমনি ধাঁধাও। সেই আদ্যিকাল থেকে বয়সের ধাঁধা চলছে, তার আর গাছ পাথর নেই। বল নিয়ে ওজনের ধাঁধায় সত্যেন বোসও একবার বসে গিয়েছিলেন বলে শুনেছি। আর ঘড়ির ধাঁধা? আইনস্টাইন যা ধাঁধিয়ে দিলেন সারা বিশ্বকে সে আর কহতব্য নয়। জ্যামিতিক ধাঁধা, ম্যাজিক স্কোয়ার, পাত্রে পাত্রে জল ঢালার ধাঁধা, সময়, দূরত্ব ও গতিবেগের ধাঁধা ইত্যাদি হাজারো রকম ধাঁধায় মাথা বনবন করে ঘুরে যাওয়াই স্বাভাবিক তবু সে যেন ঘোরে না, কেমন ঠাণ্ডা রাখে নিজেকে। এই যে আমাদের পৃথিবী, যে নাকি দুরকম ভাবে ঘুরে চলেছে, তার পৃষ্ঠে চেপেও কী আমরা তা টের পাই? পাই না তো! সেটাও কী একটা ধাঁধা নয়? এক সেকেণ্ড এতটুকু সময় এবং একশো-ছিয়াশি হাজার মাইল কত দীর্ঘ পথ এটা জেনেও এ দুয়ের সমন্বয় যদি আমাদের সহনীয় হয় তবে নীচের ধাঁধাগুলি সংখ্যার হলেও শঙ্কার নয় বলেই অনুমান করি।

(1) যে অঙ্কগুলির সাহায্যে আমরা যে কোন সংখ্যা লিখতে পারি তার সংখ্যা হল দশ এবং সেগুলি হল :—

... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...

এই সবকটি অঙ্ক ব্যবহার করে আমরা যদি দুটি মাত্র সংখ্যা লিখতে চাই তবে অনেক রকম ভাবে তা লিখতে পারি। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

(ক) 1305, 862497

(খ) 10, 98765432

(গ) 12345, 67890 ইত্যাদি

উদাহরণে যেমন দেখানো হয়েছে তেমন ভাবে গঠিত সমস্ত সংখ্যাদ্বেয়ের মধ্যে কোন দুটির গুণফল সর্বোচ্চ হবে?

(2) বীজগণিতে আমরা নানারকম সমীকরণের সমাধান করি। যেমন,

(ক) $3x+5=17$ (গ) $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x+3y+4z=20 \\ 5x-y-z=0 \end{cases}$

(খ) $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ 7x-4y=3 \end{cases}$

ইত্যাদি।

প্রথম উদাহরণে একটি রাশিই মাত্র অজানা, তাই একটি মাত্র সমীকরণ থেকেই তার মান নির্ণয় সম্ভব।

দ্বিতীয় উদাহরণে দুটি অজানা রাশির মান নির্ণয়ের জন্য দুটি (স্বাধীন) সমীকরণের প্রয়োজন।

তৃতীয় উদাহরণেও তিনটি অজানা রাশির মান নির্ণয়ের জন্য তিনটি স্বাধীন সমীকরণ দিতে হয়েছে।

অর্থাৎ স্বাধীন সমীকরণের সংখ্যা অজানা রাশির সংখ্যার সমান হওয়া প্রয়োজন। তার কম হলে অজানা রাশির মান অসংখ্য হতে পারবে। যথা, $x+y=7$

এই সমীকরণে দুটি অজানা রাশি, কিন্তু একটি মাত্র সমীকরণ। সুতরাং অজানা রাশিগুলির মান অসংখ্য হতে পারে, যেমন—

$\begin{pmatrix} x=1 \\ y=6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x=2 \\ y=5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x=1000 \\ y=-993 \end{pmatrix}$ ইত্যাদি।

নীচে তিনটি অজানা রাশি নিয়ে একটি মাত্র সমীকরণ দেওয়া হোল : $x^{13}+y^{13}=z^{14}$

অজানা রাশিগুলির মান অসংখ্য হতে পারে। যদি X, Y, Z এর মান পূর্ণ সংখ্যা হয় এবং তিনটি মান পরস্পরের থেকে বিভিন্ন হয় তবু তাদের সমাধান অসংখ্য হতে পারে। এই শেষোক্ত ধরণের যত সমাধান সম্ভব তাদের মধ্যে X, Y, Z এর ন্যূনতম মানগুলি কী কী?

(3) নীচের সমীকরণের একটিই মাত্র অজানা রাশি। রাশিটি একটি পূর্ণ সংখ্যা (= x) এবং ধনাত্মক। সমীকরণটি হোলো, $\{3737(213+x)\}^2 = *5862^{*}060836$

সমীকরণের সমতা চিহ্নের ডান দিকের বেশ বড় সংখ্যাটির প্রথম অঙ্কটি পড়া যাচ্ছে না বলে একটি তারকা-চিহ্ন দিয়ে সূচীত করা হয়েছে। এইটুকু জানা আছে যে তারকাচিহ্নটি শূন্য নয়। x এর মান কত?

(4) যে অঙ্কগুলির সাহায্যে আমরা যে কোন সংখ্যা লিখতে পারি সেগুলি নিয়ে আরেকটি ধাঁধায় ফিরে যাই। এখানেও 0, 1, 2, 3, 4, , 6, 7, 8 এবং 9 এই অঙ্কগুলি একবার মাত্র ব্যবহার করে এমন দুটি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যার একটির বর্গমূল অন্যটির ঘন মূলের (WBE ROOT) সমান হয়। যদি একটি সংখ্যা হয় X এবং অন্যটি হয় Y, তবে—

$\sqrt{X} = \sqrt[3]{Y}$ হতে হবে।

যদি $X=12045$ এবং $Y=67890$ ধরি তবে X ও Y মিলিয়ে দশটি বিভিন্ন অঙ্ক (digit) একবার মাত্র ব্যবহার করা হল বটে, কিন্তু X এর বর্গমূল, Y এর ঘন মূলের সমান হল না।

X এবং Y সংখ্যা দুটি কী কী ?

(5) বর্গ এবং "ঘন"-এর আলোচনা খুব একটা করতে চাই না, কারণ সংখ্যাগুলো এত বড় হয়ে যায় যে তাদের সামলানো মুস্কিল হয়। কম্প্যুটার-এর সাহায্যের দরকার পড়ে। যেমন ধরা যাক নীচের প্রশ্নটা ঃ

এমন কোন বর্গ সংখ্যার সন্ধান কী মিলতে পারে যার উৎপাদকগুলির সমষ্টি একটি ঘনফল সংখ্যায় পরিণত হয় ?

ধরা যাক নির্ণেয় বর্গ সংখ্যাটি হল 16 ; এর উৎপাদকগুলির যোগফল = 1 + 2 + 5 + 8 + 16 = 31

কিন্তু 31 কোন "ঘন" সংখ্যা হল না যোগফল 27 হলে সমাধান মিলে যেত। কিন্তু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান হবার নয়। কী বলো তোমরা ?

উত্তর 17 পৃষ্ঠায়

36 বি বকুল বাগান রোড, কল-25

স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিত্যসঙ্গী

Kanak

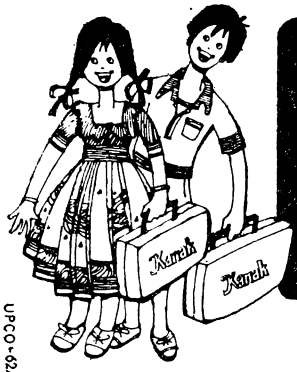

এলুমিনিয়াম স্কুল বক্স ও লাঞ্চ বক্স

UPCO-62A/82

প্রস্তুতকারকঃ

পি এল মেটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং

কলিকাতা-৭০০ ০০৫

দুমুখো নীতি কপিঞ্জল শর্মা

দশম শ্রেণীর "ফার্স্ট বয়" সন্ধ্যার সময় দাদুকে বললে—চল যাই দাদু, বাজি পোড়ানো দেখবো।

দাদু গম্ভীর হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় কত বাজি পুড়ছেরে ?

—তুমি কিস্যু খবর রাখনা দাদু ! স্বর্গোদ্যানে লাখ লাখ টাকার বাজি পুড়ছে, সারা শহরে ঢি ঢি পড়ে গেছে, মফঃস্বল থেকে হাজার হাজার লোক আসছে,—

—আরে থাম, থাম। কথার মাঝখানেই দাদু জিজ্ঞাসা করলেন—তুই এবছর দূষণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছিলি, না !

—তাতে কী হয়েছে ! তুমিই তো লিখে দিয়ে ছিলে !

—তা কিছু মনে আছে, না সেইখানে বমি করে দিয়ে এসেছিস ?

মাথা চুলকাতে চুলকাতে সুমন আমতা আমতা করে বললে—একটু মনে করিয়ে দিলে বলতে পারবো।

ভ্রূ কুঁচকে দাদু বললেন—বলিহারি তোদের ভাল ছেলেরে ! চুরি করতে পারলেই ফার্স্ট।

রুখে দাঁড়ালে সুমন। বললে—খবরদার দাদু, জীবনে কক্ষনো চুরি করি নি। হেসে বললেন দাদু—মুখস্থ করে খাতায় বমি করা আর চুরি করা দুটোই সমান।

তা যাক্। যে ছবিটা আঁকিয়ে এনেছিলি, সেটার কথা মনে আছে তো ?

সুমনের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে—তা থাকবেনা ! কত জনে কত প্রশংসা করেছিল ছবিটার ! বোম ফাটছে, তার প্রতিক্রিয়া পড়ছে চারপাশে ছোটদের মাথায়, মায়েদের পেটের ভ্রূণে, বড়দের কাণে মাথায় হৃৎপিণ্ডে। একদিকে বিকলাঙ্গ শিশু, অপরদিকে অ্যাসিড বর্ষণ ও উদ্ভিদের অবক্ষয়। সত্যি, বড় চমৎকার ছবিটা।

—বক্তৃতাও ভাল দিয়েছিলি তুই ! তবে হ্যাঁ, যত পারিস ঐ বক্তৃতা দিবি আর ছবি-শ্লাইড ইত্যাদি দেখিয়ে উপদেশই দিবি। নিজে করে জাতির কলঙ্ক হবি না।

—তুমি আমায় খামোকা বকছো কেন দাদু ? শহরের তাবৎ যত বুদ্ধিমানও বিচক্ষণরা চোখের সাধ মেটাতে আগে ভাগে গিয়ে জায়গা ঠিক করে নিয়েছে !

—ওদের কী আর বুদ্ধি আছেরে ? রাতে-দিনে হৈহল্লায়, ট্রামে-বাসে, রেডিও-টিভিতে, বাজী-পটকায়, মাইকে-মেসিনে ব্রেণের বারটা বেজে গেছে।

আমি বসেছিলাম কাছে। এবার আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যা ফ্যা করে হাসতে হাসতে দাদু বললেন—পরিবেশ শুদ্ধ রাখতে বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা হচ্ছে আর ওদিকে লাখলাখটাকারবাজি পুড়ছে। এ কেমন দু-মুখো নীতি কপিঞ্জল?

শিকার ধরার সুচতুর কৌশল জানে

কার্পেট হাঙর

সমুদ্রতলে একে দেখলে মনে হবে পুরানো লম্বাকৃতি শিলাখণ্ড একটি নড়াচড়া না করে পড়ে আছে। তার মুখের কাছে জলগুল্ম ও নানা উদ্ভিদ। আপাতনিরীহ এই পাথর আছে শিকারের অপেক্ষায়। মুখের কাছে শিকার এলেই বিরাট চোয়াল খুলে যায় আর সারি দেওয়া ধারালো দাঁতের যাঁতাকলে শিকার ধরা পড়ে।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

ক্যুইজ কনটেস্ট
জুলাই '88 VII-VIII
গ্রেড—I

1. উত্তরের ভেনিস কোন্ নগরীকে বলা হয় ?
2. ইউরোপের কোথায় ধান জন্মে ?
3. ভারতের 'কোটা' নামক স্থানটি কি জন্যে বিখ্যাত ?
4. অক্ষরেখার মধ্যে মহাবৃত্ত কোনটি ?
5. 'ফরাজি' কথাটির অর্থ কি ?
6. নবাব সিরাজউদ্দৌলার মায়ের নাম কি ছিল ?
7. সুস্থ মানুষের 100ml. রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কতো থাকে ?
8. শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের রচয়িতা কে ?
9. ম্যাগনেসিয়াম মৌলটি কে আবিষ্কার করেন ?
10. এটি কিসের ছবি ?

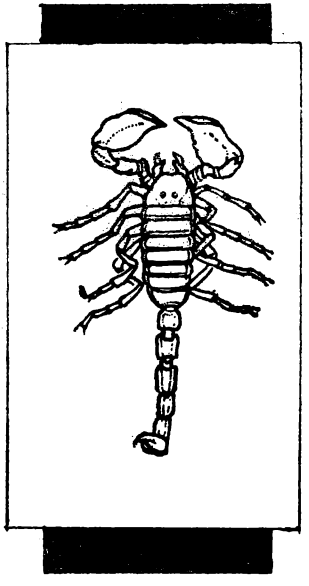

গ্রেড II

ক্যুইজ কনটেস্ট
জুলাই '88 IX—X গ্রেড—II

1. মুঘল সম্রাটেরা মোঙ্গল বংশীয় ছিলেন না। তবে তাঁরা কোন্ বংশীয় ছিলেন ?
2. বাবরের পিতার আসল নাম কি ছিল ?
3. সুফী ধর্মে গুরুকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?
4. জার্মান মনীষী W. Brandt কতো সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন ?
5. এটি কিসের ছবি ?

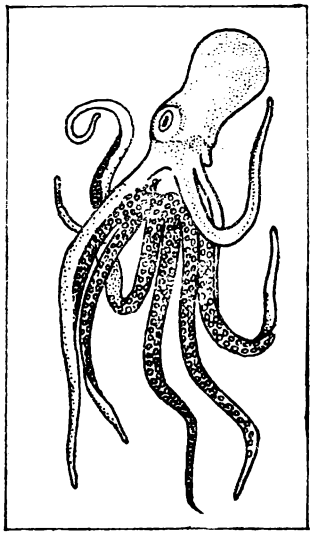

6 যে ব্যক্তি যাদুঘরের তত্ত্বাবধানে থাকেন, তাঁকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?
7. ভারতের কোন্ রাজ্যের অধিবাসীরা টুলু (Tulu) ভাষায় কথা বলেন ?
8. ভারত সর্বপ্রথম কোন্ ক্রিকেট টেস্ট খেলায় জয়লাভ করে ?
9. সর্বাপেক্ষা ভারী মৌল কোনটি ?
10. Fumicino বিমান বন্দর কোন্ শহরে অবস্থিত ?

গ্রেড III

ক্যুইজ কনটেস্ট
জুলাই '88 XI—XII
গ্রেড—III

1. কোন্ ভারতীয় সম্রাট "ভেরী ঘোষ" (যুদ্ধের দামামা ধ্বনি) কে "ধর্মঘোষ"-এ (ধর্ম বিজয়ের দামামা ধ্বনি) পরিণত করেন ?
2. ফসফরাসের অভাবে প্রাণীদের কোন্ কোন্ রোগ হয় ?
3. পলাশীর যুদ্ধ ঘটে কবে ?
4. বাবরের আত্মজীবনী 'বাবর-নামা' কোন্ ভাষায় রচিত হয়েছিল ?
5. ভারতের দীর্ঘতম সেচখাল কোনটি ?
6. জলবিভাজিকা কি ?
7. ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি ?
8. আকরিক লৌহ ভারতে কোথায় বেশি উৎপাদিত হয় ?
9. পারদ থার্মোমিটারের আবিষ্কর্তা কে?
10. এটি কিসের ছবি ?

শব্দকূট

পুলিন বিহারী সাউ জুলাই '৪৪

পাশাপাশি :—

1. 'হেলিকপ্টার' আবিষ্কর্তা। 2. সর্বাপেক্ষা দ্রুততম জলজন্তু। 6. যাতে তরল পদার্থ পরিমাপ করা যায়। 9. রক্ত জালকের মধ্যে থেকে রক্তরসের কিছু অংশ ব্যপন প্রক্রিয়ায় দেহের কলা কোষ মধ্যস্থ স্থানে বেরিয়ে আসে এবং দেহের প্রত্যেকটি কোষকে সিক্ত রাখে। সেই রসকে যে নামে অভিহিত করা হয়। 10. যে পদ্ধতির সাহায্যে কোন মিশ্রণ থেকে দ্রবীভূত ও অদ্রাব্য অবিশুদ্ধি পৃথক করে বিশুদ্ধ তরল সংগ্রহ করা হয়।

উপর নিচ :—

1. 1893 খ্রীস্টাব্দে 'এডিসন' যা আবিষ্কার করেন। 3. যে ফুলের বিজ্ঞান সম্মত নাম Ixora Rosea Wall। 4. মানুষের হৃৎপিণ্ডের প্রাকার বেষ্টিত যে অংশটিতে রক্ত সংগৃহীত হয়। 5. একটি নির্দিষ্ট দিকে কোন গতিশীল বস্তুর স্থান পরিবর্তনকে যা বলা হয়। 7. হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে ইংরেজীতে যা বলা হয়। 8. আমিবার জনন পদ্ধতি।

প্রযত্নে—এইচ. ডি. সাউ, গ্রাম ইন্দা, বোসপাড়া, পোঃ—ইন্দা খরপুর, জেলা—মেদিনীপুর-721305

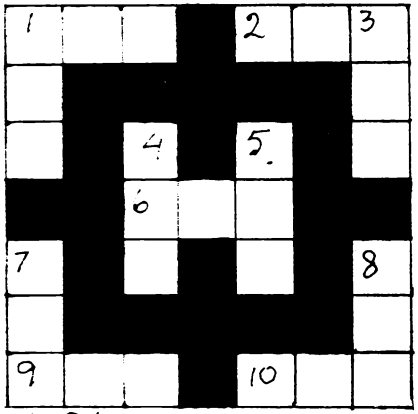

আই-কিউ-টেস্ট—জুলাই '৪৪

1. কোন চুম্বককে উত্তপ্ত করলে—
   (a) চুম্বকটি শক্তিশালী হয়, (b) চুম্বকটি দুর্বল হয়, (c) চুম্বকের মেরু দুটি অবস্থান বিনিময় করে, (d) অন্য কিছু ঘটে।
2. Bio gas-এর প্রধান উপাদান কোনটি—
   (a) মিথেন, (b) অ্যামোনিয়া, (c) বিউটেন, (e) ইথেন।
3. নিচের বিখ্যাত লোকগুলির মধ্যে কে দলছাড়া—
   (a) সিজার, (b) নেপোলিয়ন, (c) ইউক্লিড, (d) ওয়েলিংটন, (e) রোমেন।
4. ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন—
   (a) বিক্রম সারাভাই, (b) হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, (c) রাজা রামান্না।
5. হারানো সংখ্যাটি কত হবে—
   1, 4, 9, 16, 25, ..., 49।

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

মে, ৪৪ VII-VIII গ্রেড-I

1. বিভিন্ন পদার্থের তাপপরিবাহিতা বিভিন্ন। 2. অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী। 3. সান্দাকফু। 4. লণ্ডনে টেমস নদীর নিচে। 5. সিয়্যাল (Sial) 6. 1853 খ্রীস্টাব্দে 7. উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে। 8. 1 : 14 : 48 9. কেম। 10. মহারাষ্ট্রে। জীপগাড়ী তৈরি হয়।

মে ৪৪ IX-X গ্রেড-II

1. রাজা রামমোহন রায়। 2. ইয়ং বেঙ্গল এর প্রতিষ্ঠাতা হেনরী—ভিভিয়ান ডিরোজিও। 3. মৌনালোয়া (হাওয়াই) 4. নীলকান্ত মণি। 5. ধানের চোষা পোকা বা গন্ধি পোকা। 6. নিকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্র। 7. VISCO – পুরো নাম হলো বিশ্বেশ্বরায়া আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড। কর্ণাটক প্রদেশের ভদ্রাবতী তীরে অবস্থিত। 8. ট্যানসলে, 1935 খ্রীস্টাব্দে 9. 'ডিপনয়' নামক মাছ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। 10. লিলি। মে, ৪৪ XI-XII গ্রেড-III

1. সোভিয়েত ইউনিয়ন। 2. শিকাগো। 3. উত্তর রেলপথ। দৈর্ঘ্য 10,975 কিলোমিটার। 4. 1924 খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের CHAMONIX নামক স্থানে 5. বাদুড় আদৌ ডিম পাড়ে না। 6. জলজ প্রাণী ও সরীসৃপ। 7. রাজস্থানে অবস্থিত। এটি পাখির অভয়ারণ্য। 8. এরা glide করে। অর্থাৎ বাতাসে ভর করে ধীরে গমন করে। 10. 'রাস্ট রেড' পোকা।

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই-কিউ-টেস্ট—মে '৪৪-এর সমাধান

1. 13। (c) স্টিয়ারিক অ্যাসিড। 3. (d তড়িৎ লেপন। 4. (c) কাছাকাছি কোন থানায় জমা দেবে। 5. 414।

শব্দকূট সমাধান

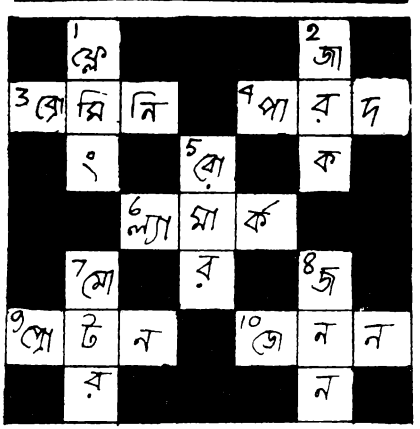

টিক (রক্তপায়ী কীট)

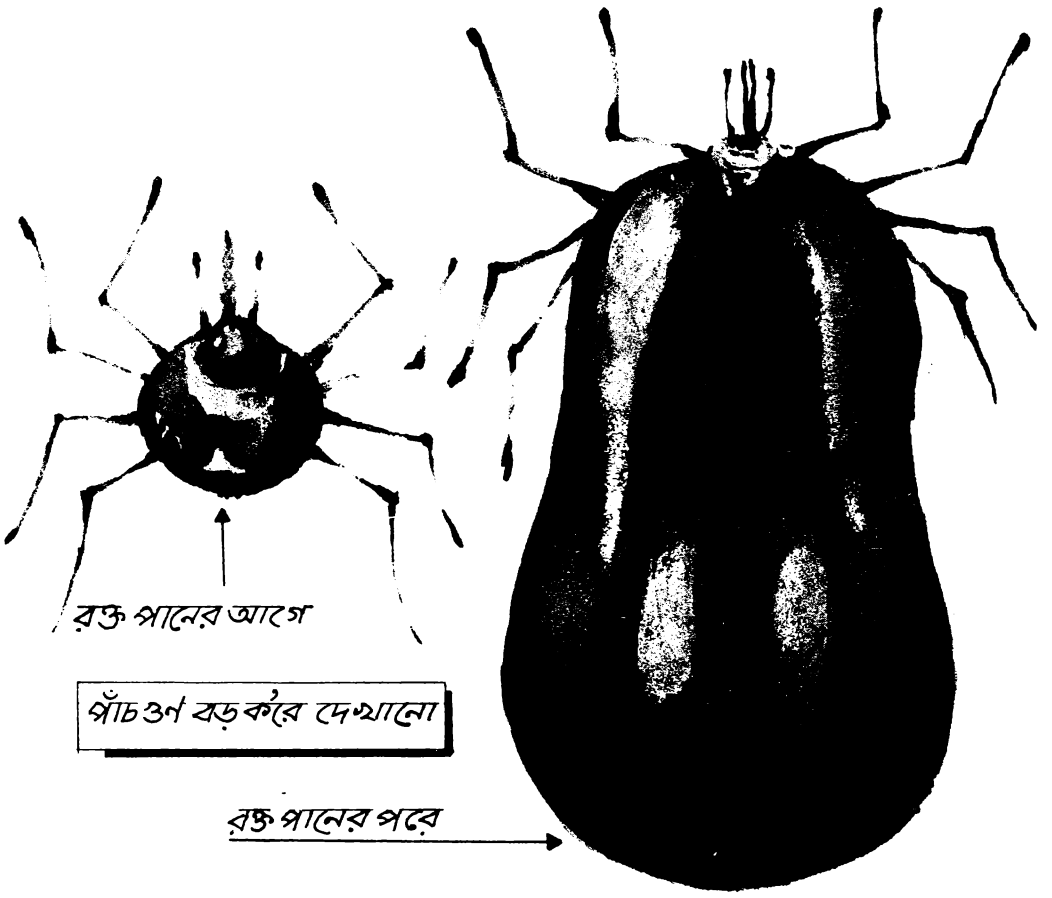

টিক এক প্রকার পরজীবী। বৈজ্ঞানিক নাম ইক্সোডেস রিসিনাস (Ixodes ricinus)। এদের মুখে অসংখ্য দাঁত আছে যার সাহায্যে এরা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শরীরে রক্ত শোষণের জন্য গর্ত করে। প্রচুর পরিমাণে এরা রক্ত শোষণ করতে পারে। বিশেষ করে স্ত্রী টিক। একটা ক্ষুধার্ত টিক নিজের শরীরের প্রায় 230 গুণ রক্ত শোষণ করতে পারে। এতটা রক্ত শোষণ করার পর এদের দেখতেও হয় অদ্ভুত।

সাধারণতঃ ঘাসের ডগায় এরা বসে অপেক্ষা করে এবং প্রার্থিত প্রাণীর ওপর সুযোগ পেলে লাফিয়ে প'ড়ে চামড়ার নরম জায়গায় কামড়ে ধরে। তারপর গর্ত করে রক্ত শোষণ আরম্ভ করে। মুখ দিয়ে এক প্রকার ইক্সোডিন নামক লালা বের করে আক্রান্ত প্রাণীর ক্ষতস্থানটা অসাড় করে দেয়।

কিছু প্রজাতির টিক একটি আক্রান্ত প্রাণীর শরীরেই জীবন চক্র সম্পূর্ণ করে। আবার কিছু প্রজাতি কয়েকটি প্রাণীর শরীরের ওপর নির্ভর করে। এই টিকেরা কয়েক রকম রোগ জীবাণু বহন করে তার মধ্যে এনকেফেলাইটিস অন্যতম।

অলয় ঘোষাল

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর।

জোনাকিরা যে নীল নীল আলো বিতরণ করে, তার উৎস কী ?

উঃ জোনাকিরা পেটের তলা থেকে যে নীল নীল আলো বিতরণ করে তার উৎস লুসিফেরিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এ ছাড়া লুসিফেরাস নামে এক ধরনের উৎসেচক বা এনজাইমও ঐ আলের মূলে আছে। উৎসেচকটি জোনাকিদের দেহে আবার আপনিই তৈরি হয়। যখন লুসিফেরিন বাহিরে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে তখনই উৎসেচকের উপস্থিতিতে জারিত হয়। ঐ কারণে নির্গত হয় শক্তি এবং এই শক্তির প্রকাশ ঘটে হালকা নীল আলোর মাধ্যমে। লুসিফেরিন ফসফরাসের একটি যৌগ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এ মাসের প্রশ্ন

ব্লিচিং পাউডার জীবাণুনাশক হিসাবে কাজ করার কারণ কী ? এটি মানুষের কী কোন ক্ষতি করে না এবং এর ফরমুলা কী ?

প্রশ্ন পাঠিয়েছে নড়ুগোপাল মান্না, চাতরা—বাঁকুড়া থেকে।

প্রঃ মদেও থাকে অ্যালকোহল এবং অনেক ওষধেও থাকে অ্যালকোহল। মদ্যপানে শরীরের যখন ক্ষতি হয়, তখন অ্যালকোহল যুক্ত ওষুধেও তো ক্ষতি হওয়ার কথা। কিন্তু তেমন ওষুধকে আবার জীবনদায়ী বলা হচ্ছে কেন ? বিশু মিত্র, আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন।

উঃ অ্যালকোহল একটি উত্তম দ্রাবক। ওষুধের বিভিন্ন উপাদানকে দ্রবীভূত করানোর জন্য দ্রাবক হিসাবে এবং শরীরের যন্ত্রপাতিগুলিকে সাময়িকভাবে একটু কর্মক্ষম করানোর জন্য ওকে ওষুধে ব্যবহার করা হয়। তবে ওষুধ হিসাবে ওকে যে পরিমাণে গ্রহণ করা হয় তা তার ক্ষতিকর মাত্রার অনেক নিম্নে !

মদ হিসাবে যাঁরা অ্যালকোহল গ্রহণ করেন তাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ অনেক বেশি। অ্যালকোহলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পানের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। পাকস্থলীতে ওর বিশোষণ অতি সামান্য এবং প্রায় সবটাই বিশোষিত হয় ক্ষুদ্রান্ত্রে। উক্ত কারণে রক্তে প্রায় সরাসরি অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়। ঐ অনুপ্রবেশের পরিমাণ যদি শতকরা 0·03 ভাগের মত হয় তাহলে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। ঐ পরিমাণের আধিক্য ঘটলেই নানা ধরনের ক্ষতি করে। ওষুধের সঙ্গে যতটুকু অ্যালকোহল পেটে যায় তাতে রক্তে উপরোক্ত পরিমাণের অনেক কম অনুপ্রবেশ করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, বাজারের ভিটামিন-যুক্ত টনিকগুলিতেই অ্যালকোহল থাকে। বিশেষজ্ঞরা নির্দেশ দিয়েছেন, ঐ টনিকগুলি আদৌ জীবনদায়ী নয় এবং এগুলো শরীরের উপকারে তেমন আসে না। পরিবর্তে ঐ মূল্যের পুষ্টিকর খাদ্য কিনে খেলে শরীর অনেক উপকৃত হয়। আর দ্রাবক হিসাবে যে সব ওষুধে অ্যালকোহল থাকে তার পরিমাণ তো অতি সামান্যই। যেমন—হোমিওপ্যাথি ওষুধ ইত্যাদি।

প্রঃ প্লাস্টিক সার্জারি কি ? এর আবিষ্কারক কে ? অভিজিৎ সাহা, গঙ্গারামপুর, পশ্চিমদিনাজপুর।

উঃ প্লাস্টিক সার্জারিকে বাংলায় বলা হয় পুনর্গাঠনিক শল্যচিকিৎসা। উক্ত শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে বিকৃত কিংবা পঙ্গু অঙ্গের পুনর্গঠন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ঐ পদ্ধতির এমন অভাবনীয় ভাবে উন্নতি হয়েছে যে, মানব শরীরের কিডনী, হৃৎপিণ্ড, চক্ষু ইত্যাদি অকেজো হয়ে গেলেও তাদের নতুন করে অধিরোপণ করা হচ্ছে।

প্লাস্টিক সার্জারি কিন্তু বহু পূর্বে ভারত আবিষ্কার করেছিল ! সুশ্রুত সংহিতায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতে এই পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিতও ছিল। এমন কি ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকেও কোন কোন শল্য-চিকিৎসক চোখ, কান ইত্যাদি কাটা পড়লে, তাদের পুনর্গঠন করিয়ে দিতে পারতেন। পাশ্চাত্যে উক্ত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন ডাঃ আইভারসন নামে এক মার্কিন শল্যচিকিৎসক। কথিত আছে, বসন্তের দাগে ভর্তি এক তরুণীর মুখশ্রীকে ফিরিয়ে আনতে তিনি বিস্তর চিন্তাভাবনা করেন এবং এক রেড ইণ্ডিয়ানের উল্কি কাটানো ও উল্কিকে তুলে দেওয়ার

পদ্ধতিকে অনুকরণ করে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই নতুন শল্যচিকিৎসার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এই সম্পর্কে আরও লেখা এই সংখ্যাতেই ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর "জানা-অনাজা" তে পাবে।

প্রঃ ব্যাকটিরিয়ারা কিভাবে জননকার্য সম্পন্ন করে? সুশীলকুমার ভূঞ্যা, ভেটুরিয়া, মেদিনীপুর।

উঃ ব্যাকটিরিয়ারা অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন—এই তিন প্রক্রিয়ায় জননক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে।

অঙ্গজ জনন দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করে থাকে। দ্বিবিভাজ প্রক্রিয়া এবং বাডিং বা মুকুলোদগন প্রক্রিয়া। প্রথম প্রক্রিয়া অনুযায়ী ব্যাকটিরিয়ার কোষটি বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্যকোষে পরিণত হয়। বিভাজনের সময় ঈষৎ লম্বাটে হয়ে পড়ে। তারপর মধ্যাংশ সঙ্কুচিত হয় এবং নিউক্লিয়াসটি দুটি খণ্ডাংশে বিভক্ত হয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় কোমল কোষপ্রাচীরের বিবর্তিত একটি অংশ থেকে মুকুলের মত জিনিস আত্মপ্রকাশ করে এবং ধীরে ধরে নিউক্লিয়াসটির একটি খণ্ডাংশ ঐ মুকুলে প্রবেশ করে। পরে মুকুলটি বর্ধিত হয়ে এক সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নতুন ব্যাকটিরিয়ার জন্মদান করে।

অযৌন উপায়ে ব্যাকটিরিয়ার জনন তিন উপায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। (1) অন্তঃরেণু, (2) গনিয়িডা, (3) কনিডিয়া। প্রথম প্রক্রিয়ায় পরিবেশের তারতম্য অনুসারে অনেক সময় কোষের প্রোটোপ্লাজম সঙ্কুচিত হয়ে চারদিকে একটা প্রাচীর গঠন করে এবং অন্তঃরেণুরূপে মাতৃকোষেই অবস্থান করে। পরে অনুকূল পরিবেশ লাভ করলে কোষপ্রাচীর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে এবং একটি ব্যাকটিরিয়ায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় কোষের প্রোটোপ্লাজম খণ্ডিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্লাজেলাযুক্ত গনিডিয়ার সৃষ্টি করে। মাতৃকোষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর গনিডিয়া বেরিয়ে আসে। পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে নতুন ব্যাকটিরিয়ার পরিণত হয়। তৃতীয় কনিডিয়া প্রক্রিয়ায় ব্যাকটিরিয়ার দেহ একদিক থেকে খণ্ডিত হয়ে শৃঙ্খলের মত যুক্ত রেণু উৎপন্ন করে। পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্মদান করে নতুন ব্যাকটিরিয়ার।

যৌন জননও তিনটি প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রথম সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যাকটিরিয়ারা পাশাপাশি অবস্থানকালে যৌন জননের সময় একটি নালীপথ গঠন করে এবং পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। একটি দাতা, অপরটি গ্রহীতা। দাতার ক্রোমোজোম গ্রহীতার কোষে প্রবেশের পর কোষদ্বয় বিচ্ছিন্ন হয়! গ্রহীতার কোষে তখন নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্রোমোজোমের উদ্ভব হয়। পরে ঐ ক্রোমোজোম বিভাজিত হয়ে নতুন ব্যাকটিরিয়ার জন্ম দেয়। দ্বিতীয় রূপান্তর ভবন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটিরিয়ার দেহ ধ্বংস হয়ে গেলে তার পরিশ্রুত ডি. এন. এ বিশোষণের ফলে অপর ব্যাকটিরিয়ার পুনঃসংযোগ ঘটে। এই অবস্থায়ও সৃষ্টি হয় নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যাকটিরিয়া।

প্রঃ টিটেনাস রোগের কারণ ও লক্ষণ কী এবং প্রতিকারের উপায়ই বা কী? অনিরুদ্ধ রায়, 2 দলপতি রোড, নূতনগঞ্জ, বর্ধমান।

উঃ ব্যাসিলাস টিটনি নামে এক জাতীয় জীবাণুর রক্তে অনুপ্রবেশের ফলে টিটেনাস রোগ হয়: সাধারণতঃ পথ দুর্ঘটনা, মরিচা ধরা লোহাতে শরীরের কোন অংশ কেটে যাওয়া, কাঁটা বেঁধা বা অন্য কোন কারণে রক্তপাত ঘটলে জীবাণুর রক্তে অনুপ্রবেশ ঘটে এবং অল্পকালের মধ্যেই রক্তে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন সৃষ্টি করে। ঐ টক্সিন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লেই টিটেনাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

টিটেনাস খুব মারাত্মক রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় দাঁত কপাটি লাগে, চোয়াল ধরে যায়, গলায় ব্যথা হয়, ঘাড়ে ব্যথা হয়। তারপর খিঁচুনি এবং শ্বাসকষ্ট আসে আর শরীর ধনুকের মত বেঁকে যায়। পরের দিকে জ্বরও আসে। এর একমাত্র প্রতিকার, রক্তপাত হলে মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যে অ্যান্টিটিটেনাস সিরাম (এ-টি-এস) ইনজেক্শন নেওয়া। শিশু অবস্থায় বিশেষ বিশেষ সময়ে এর প্রতিষেধক টিকা দানের ব্যবস্থা আছে। অপরদিকে রোগাক্রান্ত কেউ হলেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রঃ লিউকিমিয়া রোগটি কী? এ-রোগ কী সারে না? যদি না সারে তাহলে রোগীকে টিকিয়েও কী রাখা যায় না? প্রসেনজিৎ মুখার্জি, দশম শ্রেণী।

উঃ চলিত কথায় রোগটিকে ব্লাডক্যানস্যার বলা হয়। রোগটি অত্যন্ত মারাত্মক। রক্তে শ্বেতকণিকার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং রক্তে অপরিণত শ্বেতকণিকার প্রবেশ ঘটলে লিউকিমিয়া হয়। ছোটদের রোগটি বেশি হয়। তবে পরিণত বয়সেও হয়ে থাকে। ছোটদের ক্ষেত্রে সামান্য জ্বর, রক্তশূন্যতা, গলাব্যথা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, যকৃত প্লীহা বৃদ্ধি, গ্রন্থি বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রধান লক্ষণ। বয়স্কদের ক্ষেত্রে আমাশয়, রক্তশূন্যতা প্লীহাবৃদ্ধি, গ্রন্থিবৃদ্ধি ইত্যাদি হয়ে থাকে!

লিউকিমিয়ার কিছু কিছু প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। বারবার রক্ত পরিবর্তন, এক্স রে চিকিৎসা, প্রভৃতির মাধ্যমে রোগকে দীর্ঘকাল ঠেকিয়ে রাখা যায়। তবে প্রথম থেকেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে চিকিৎসাও বেশ খরচ বহুল।

প্রঃ সাগরের ঢেউ কী কী কারণে সৃষ্টি হয়? সোমা ব্যানার্জি, বেলিয়াতোড়-বাঁকুড়া।

উঃ বেশ কয়েকটি কারণে সাগরে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। প্রথম ও প্রধান কারণ বাতাস। বাতাসের গতিবেগ যত বাড়ে ততই ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ সাগরতলায় যদি

কোথাও ভূমিকম্প হয় তাহলেও সৃষ্টি হয় ঢেউ এবং ঢেউ বড় ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। তৃতীয়তঃ সাগরবক্ষে নিম্নচাপ কেন্দ্রীভূত হলেও প্রবল ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয় এবং ঢেউ ওঠে। এ ঢেউও ভয়ঙ্কর এবং এর প্রভাবে কখনও কখনও জলস্তম্ভেরও সৃষ্টি হয়।

প্রঃ ভিটামিন Eর অভাবে কী কী হয়ে থাকে ? মির্জা নূর আলম, পহলানপুর হাইস্কুল, রায়না-বর্ধমান।

উঃ ভিটামিন E কে টোকো ফেরল বলা হয়। যার অর্থ শিশু প্রজনন। অর্থাৎ এই ভিটামিনটি বন্ধ্যাত্ব নিবারণের সহায়ক! এর অভাবে রোগ হয়না বলে অনেকের ধারণা এবং শরীরে এর অভাবও বড় একটা দেখা যায় না।

সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস

পায়ে পায়ে চটপটি

অপরাজিত বসু

রসায়নের পরীক্ষাগারে দর্শনার্থীকে স্বাগত জানাবার সবচেয়ে ভালো উপায় কি? মিথাইল স্যালিসেট এস্টারের মিষ্টিগন্ধ ছড়িয়ে অথবা হাইড্রোজেন-বটল ফাটিয়ে? আমার মনে হয়, নাইট্রোজেন আয়োডাইডের চটপটি ব্যবস্থা করে এ কাজটি সবচেয়ে ভালো হয়। আগন্তুক চলতে ফিরতে চট্‌পট্‌ আওয়াজ পাবে, পায়ে পায়ে বাজবে রসায়নের ধ্বনি।

কিভাবে এ কাজ করবো? একটা টেস্টটিউবে পটাশিয়াম আয়োডাইডের দ্রবণ নিয়ে তাতে কয়েকটা আয়োডিন দানা নাও। আয়োডিন দ্রবণে গুলে যাবে। এবার ওর মধ্যে বেশ খানিকটা ঘন অ্যামোনিয়া দ্রবণ ঢাল। ভাল করে মিশিয়ে নাও। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল তোমার নাইট্রোজেন আয়োডাইড! ঘন বাদামী রঙের দ্রবণটিকে এবার পরীক্ষাগারের টেবিলের দরজার মুখে ফোঁটা ফোঁটা ছড়িয়ে দাও, শুধু লক্ষ্য রেখো দরজার কাছে যেন রোদ থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে রোদে নাইট্রোজেন আয়োডাইড শুকিয়ে যাবে। এবার কেউ যদি শুকনো আয়োডাইডের উপর দিয়ে জুতো পায়ে হেঁটে আসে তবে পিট্‌পিট্‌ আওয়াজ উঠবে।

নাইট্রোজেন আয়োডাইড একটি বিস্ফোরক পদার্থ। শুকনো পায়ের চাপে ফেটে যায়—সঙ্গে সঙ্গে শব্দও হয়। আয়োডাইডের উপর আগন্তুকরা হাঁটবে ফিরবে, আর পায়ে পায়ে উঠবে চিট পিট্‌ মধুর আওয়াজ। কি, এর থেকে ভালো স্বাগত জানাবার আর কি কোন উপায় আছে?

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যে বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিষয়সূচী

বিজ্ঞানভিত্তিক অনুবাদ গল্প

ধরণী ঘোষ ॥ সৌরেন ভট্টাচার্য এবং এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

দিলীপ সিংহ ॥ সুধাংশু পাত্র ॥ বিমান বসু রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দিবাকর সেন ॥ অমিত চক্রবর্তী ॥ মৃন্ময়ী দাস ॥ আবদুল হক খন্দকার ॥ অলক সেন। অসীমা চট্টোপাধ্যায় ॥ রতন মোহন খান ॥ অশোক দাস ও উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

হাতে-কলমে এক্সপেরিমেন্টস

অপরাজিত বসু ॥ সমীর কুমার ঘোষ ॥ সন্তোষ মিত্র ॥ শাহজাহান তপন ও সুকুমার গুপ্ত

রোমাঞ্চকর প্রবন্ধ

জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার ॥ শ্রীপান্থ

পড়াশোনা

অমরনাথ রায় ॥ সমীরকুমার ঘোষ সুধাংশু পাত্র ॥ অসীম কুমার মুখোপাধ্যায় ও বিভাবসু ঘোষ

প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার

ক্যুইজ কনটেস্ট ॥ আইকিউ টেস্ট ও অনেক নতুন প্রতিযোগিতা

এ ছাড়া অজস্র আকর্ষণ

বেরোবে মহালয়ার আগেই

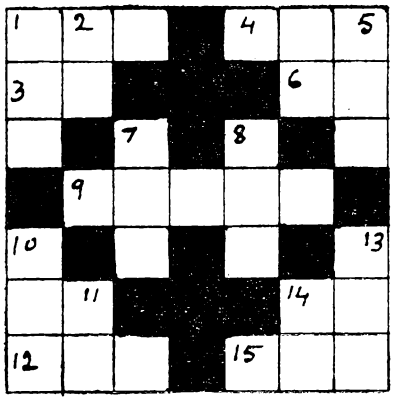

ছক-1

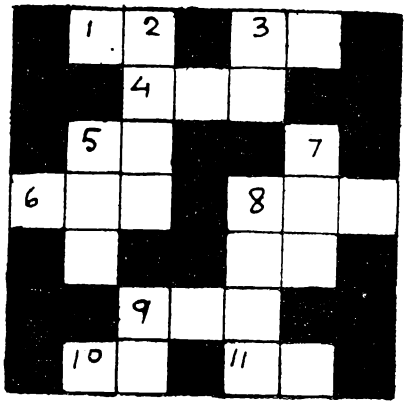

ছক-4

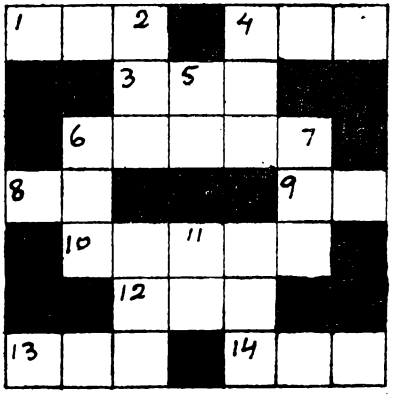

ছক-2

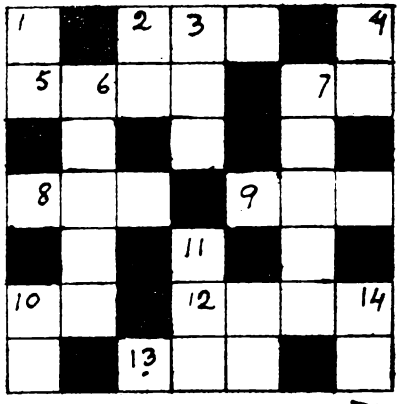

ছক-5

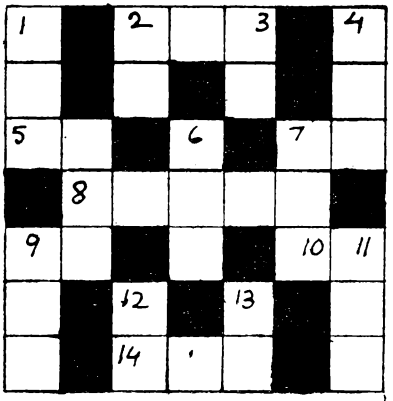

ছক-3

শব্দকূট প্রণেতাদের প্রতি

শব্দকূট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা যেন জুলাই '৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত পাঁচটি ছকের যে কোন একটি পূরণ করে তাদের শব্দকূট তৈরী করে। বেশী ঘরের অনেকে শব্দকূট তৈরি করে পাঠানোয় টেকনিক্যাল অসুবিধার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তা' প্রকাশ করা সম্ভব সম্ভব হচ্ছে না, প্রেরক নিজেও হতাশ হচ্ছে। ছকগুলিতে প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই থাকা বাঞ্ছনীয়। শব্দকূটের সঙ্গে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা অবশ্যই দিতে ভুলবে না।

সম্পাদক ঃ কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

বিজ্ঞান সংবাদ

গত 12ই জুন '৪৪ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অ্যাসেম্বলী সাইন্স লাভার্সের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ছিল পরিবেশ সমস্যার উপর কুইজ, বসে আঁকো ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন '৪৪

স্থান - মহারানী কাশীশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মুর্শিদাবাদ। জিলা বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালায় 5ই, 6ই ও 7ই জুন বিশ্বপরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 5ই জুন সকালে পদযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা ঘটে। শ্রীসমরজিৎ কর এই দিন বিকেলে একটি গাছ লাগিয়ে বিকেলের কর্মসূচীর সূচনা ঘটান। এইদিন সায়াহ্নে একটি আলোচনা সভায় তিনি অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যাতে কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ বাস্তবে রূপ পেতে পারে সেদিকে বিজ্ঞান ক্লাবগুলির এগিয়ে যাওয়া উচিত এই মত প্রকাশ করেন।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার 7ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত থাকতে পারেনি অথচ সফল প্রতিযোগী তাদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার 31 জুলাই 1988-এর মধ্যে সংগ্রহ করে নেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ঐ তারিখের পর—তাদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার ডাকযোগে পাঠানো হবে।

পরিচালক

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

বিঃ দ্রঃ মডেল প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র ও দেবকুমার রায় প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচিত হয়েছে। এদের দুজনকেই মডেলের নির্মাণ ব্যয় ও সার্টিফিকেট নেবার জন্য দপ্তরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সফল উত্তরদাতাদের নাম

মে '88-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **পলাশ কুমার বড়াল** প্রযত্নে, অশোক কুমার বড়াল সুভাষ ব্লক, গ্রাম —মানিকপুর পোস্ট—হরিনাভি জেলা—24-পরগনা।

2 **তপন কুমার বসাক** প্রযত্নে, আনন্দ মোহন বসাক, গ্রাম —নং 2 নূতন ফুলিয়া, পোস্ট - ফুলিয়া কলোনী. জেলা—নদীয়া—741402

3. **অশোক কুমার চক্রবর্তী** প্রযত্নে, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী জাঙ্গালপাড়া পোস্ট—সিউড়ি জেলা—বীরভূম।

4. **কৌশিক সুর** 190, আন্দুল রোড গভঃ রেণ্টাল হাউসিং এস্টেট ফ্ল্যাট নং RL-6 হাওড়া—9

5. **সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ** জয়রামপুর (এস. টি. রোড) শুকদেবপুর 24 পরগনা—743503

6. **মৃণালকান্তি বেরা** প্রযত্নে, শশাঙ্কশেখর বেরা গ্রাম—কানাশি বৃন্দাবনচক পোস্ট—মাগুরি জগন্নাথচক্ (পাঁশকুড়া আর এস,) জেলা—মেদিনীপুর 721139.

অধিরূপ মুখার্জী প্রযত্নে, কে. ডি মুখার্জী পোস্ট—সুকচর জেলা—24-পরগনা 743179।

8. **মৌসুমী ঘোষ** প্রযত্নে, বিভূতিভূষণ গুহ কো-অপারেটিভ কলোনী রবীন্দ্রপল্লী পোস্ট—সিউড়ি জেলা—বীরভূম-731101।

9. **সৌগত দত্ত** প্রযত্নে, কল্পনা দত্ত পোস্ট—বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া জেলা—হুগলী-712105।

10 **মিনতি ঘোষ** গ্রাম—জয়রামপুর পোস্ট—শুকদেবপুর, জেলা—24-পরগনা 743503

মে '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. **দেবরাজ দত্ত** (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) BB-48/4, সল্টলেক সিটি কলকাতা—700064

2. **কৌশিক পট্টনায়ক** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) গ্রাম -শালিকা পোস্ট—হরিদাসপুর জেলা—মেদিনীপুর-721653

3. **তন্ময় মহাপাত্র** (নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড কলকাতা-700010

মে '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ কৃষ্ণশরণ জানা, অনির্বাণ দাস, অরিন্দম চন্দ্র **হাওড়া ঃ** বিবেকানন্দ সাউ, **হুগলী ঃ** পৃথিরাজ ঢ্যাং, **নদীয়া ঃ** বসুমিত্রা সরকার,

মেদিনীপুর : যুধাজিৎ দত্ত, **মুর্শিদাবাদ :** মানসী গরাই, **বীরভূম :** বিশ্বপ্রিয় চন্দ্র, **বাঁকুড়া :** অনির্বাণ কর, বিশ্বপ্রিয় মুখার্জী, সুনীলবরণ দাশ চক্রবর্তী, সরস্বতী সেন, অরুণানন্দ কর্মকার। **পুরুলিয়া :** পার্থপ্রতিম নাথ।

মে '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনস্টেট গ্রেড III-এর সর্বাধিক আটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. **সুজনবন্ধু সামন্ত** পোস্ট—এস. এস. পাটনা জেলা—মেদিনীপুর 721169
2. **মিনতি ঘোষ** গ্রাম—জয়রামপুর পোস্ট—শুকদেবপুর জেলা—24-পরগনা 743503
3. **শিপ্রা পাল** প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল পোস্ট—চাকদহ (নেতাজী পার্ক) জেলা—নদীয়া-741222

মে '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II-এর উত্তর প্রদান আশানুরূপ না হওয়ায় কোন নাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

ক্যুইজ কনটেস্ট, আইকিউ টেস্ট-এর উত্তরদাতাদের প্রতি

ক্যুইজ কনটেস্ট ও আই কিউ টেস্ট এর প্রতিযোগীদের অনুরোধ করা হচ্ছে উত্তরপত্রের সঙ্গে যেন অবশ্য প্রতিযোগিতার কুপন যুক্ত করে পাঠানো হয়। এবং সমাধানপত্রের অর্থাৎ খাম বা চিঠির উপরে পরিষ্কার ভাবে প্রতিযোগিতার নাম ও বিভাগ লিখতে হবে।

শোক সংবাদ

নিউ জয়কালী প্রেসের অন্যতম অংশীদার ও পরিচালক মনোরঞ্জন পান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 2 মার্চ 1988 তারিখে পরলোক গমন করেন। প্রয়াত মনোরঞ্জন পানের সঙ্গে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নিউজয়কালী প্রেস থেকেই দীর্ঘদিনধরে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। আমারা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তরদাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

জুলাই '৪৪ সংখ্যার ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড-1 **অমরনাথ রায়ের সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস**

গ্রেড-2 **সমরজিৎ করের পরমাণু গবেষণায় ভারত**

গ্রেড-3 **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীল মানুষের কাহিনী**

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেটেস্ট উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম .....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

রিচার্জেব্‌ল্ টর্চ

সৌগত দত্ত ও অরিন্দম রক্ষিত

টর্চের জন্য আজ এমন একটা ব্যাটারির কথা বলব যেটা সত্যিই রিচার্জেব্‌ল্। এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস-গুলো হল।

1. রেজিস্টার 150 Ω 1/2 watt—একটা
2. " 470k Ω 1 watt—"
3. কাপাসিটর 0·22 mfd 440 v —"
4. ডায়োড IN 4005—চারটে
5. Ni - cd Button cell (Rechargeable) —তিনটে (1.25 V, 225 m A H)
6. তিন ভোল্টের টুনি বাল্ব ON-OFF সুইচ ও একটা ভেরোবোর্ড।

Diagram এ দেখে রেজিস্টর ডায়োড ও ক্যাপাসিটর গুলো বুঝে নাও। Ni-cd Button cell তিনটে পর পর বসিয়ে (—) ও (+) থেকে তার দিয়ে ছবির মতন ঝেড়ে ফেল। ভেরোবোর্ডের 5 ও 6 নম্বর প্রান্ত থেকে দুটো তার প্লাগ উল্টে লাগিয়ে নাও। কাজ শেষ করে Diagram এর সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

সতর্কতা ঃ—

1. সমগ্র CIRCUITটা কার্ডবোর্ডের বাক্সের মধ্যে রেখে ব্যবহার করবে ও চার্জ অবস্থায় সার্কিটে হাত দেবে না।
2. চার্জের সময় সুইচ যেন OFF অবস্থায় থাকে।

C/o কল্পনা দত্ত পোঃ বুড়োশিবতলা চুঁচুড়া হুগলী পিন-712105।

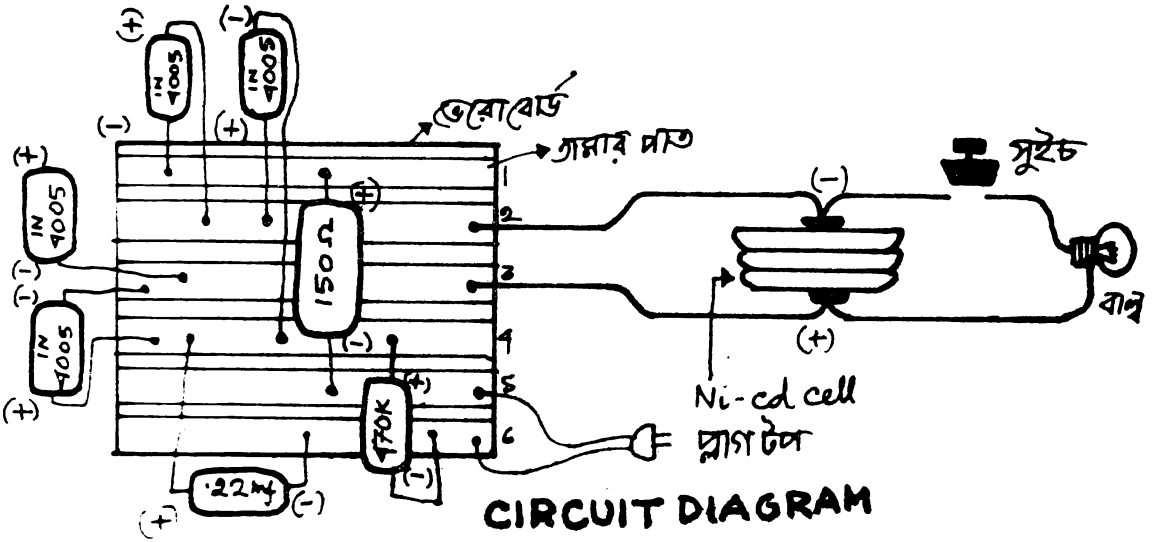

সায়েন্স অ্যাপটিচিউড অ্যাণ্ড ট্যালেণ্ট সার্চ টেস্ট

এ বছরে সায়েন্স অ্যাপটিচিউড অ্যাণ্ড ট্যালেণ্ট টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী 25 সেপ্টেম্বর 1988। 22শে আগস্ট 1988 এর মধ্যে অবশ্যই নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য ও নমুনা প্রশ্নের জন্যে যোগাযোগ করতে হবে।

All India Science Teachers Assocation (W. B. Branch)
98 Beltala Road, Calcutta-26
(মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা 5—6টার মধ্যে)

নমুনা প্রশ্ন

নিচের ঠিকানাতেও সরবরাহ সাপেক্ষে পাওয়া যাবে
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-9

জানা-অজানা

এ্যাপেণ্ডিক্স অপারেশন

এখন তোমরা প্রায়ই শোন অমুকের এ্যাপেণ্ডিক্স অপারেশন হয়েছে। কিছুই গুরুত্ব নেই, দিন দশেক হাসপাতালে বাস হয়ে গেল। কিন্তু প্রথম এই নিয়ে কত ভাবনা ছিল। 1837তে ফিলাডেলফিয়ার হাসপাতালের ডাক্তার টমাস মর্টনের কাছে 15 বছর বয়সের এক তরুণকে আনা হল। সাংঘাতিক পেট বেদনা বমি। মর্টন দেখলেন এ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছে। তখন পর্যন্ত এই রোগের জন্য অপারেশন করার কথা হয়নি। মর্টন দেখলেন ঐ ফোলা এ্যাপেণ্ডিক্স কেটে বাদ না দিলে রোগী বাঁচবে না। ভাবনা চিন্তা করে তিনি পেট কেটে ফেলে এ্যাপেণ্ডিক্স বাদ দিলেন রোগী বাঁচল। তারিখটা হল 1887 এর 27 এপ্রিল। এর দেখাদেখি লণ্ডন হাসপাতালে 1888র 27 জুন দ্বিতীয় অপারেশন হয়।

সিজারিয়ান অপারেশন

প্রথম সিজারিয়ান অপারেশনের কথা শুনলে তোমাদের চোখ কপালে উঠবে। আজকাল তোমরা অনবরত শোন অমুকের সিজারিয়ান অপারেশন হয়ে বাচ্চা হয়েছে। হাসপাতালে নার্সিং হোমে অসংখ্য। এর আদি পর্বটা শোন। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার এক আইন করেছিলেন যে গর্ভবতী অবস্থায় কোনও মা মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে পেট কেটে শিশুটিকে বের করে ফেলতে হবে হয়ত হঠাৎ শিশুটিকে জীবিত অবস্থাতে পাওয়া যেতে পারে। এই আইনের নাম হল লেক্স সিজারিয়া। এই থেকেই সিজারিয়ান অপারেশনের নাম দেওয়া হয়েছে।

প্লাস্টিক সার্জারির ঘটনা

1814 সালের 23 অক্টোবর ব্রিটেনের ইয়র্ক হাসপাতালে একজন পদস্থ সৈনিক আসেন। তখন পারদঘটিত ঔষধ খুব ব্যবহার করা হত। কারও কারও খুব ক্ষতি হত। ঐ সৈনিকের নাকে ঘা হয়ে নাক খসে পড়েছিল। ঐ হাসপাতালের সার্জন ডঃ জোসেফ কনস্ট্যানটাইন কারপিউ একখানা জানাল পড়েছিলেন। নাম হল জেনটেলমেনস ম্যাগাজিন। ছাপা হয়েছিল 1794 এ। ঐ ম্যাগাজিনে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষে কাওয়াসজী নামে একজন গাড়োয়ানকে চুরির দায়ে নাক কেটে দেওয়া হয়েছিল। পরে একজন সামরিক বিভাগের চিকিৎসক সুশ্রুত সংহিতার বর্ণনা মত গালের পাশ থেকে চামড়া কেটে কিভাবে ঐ নাক তৈরী করে দিয়েছিল। ডাঃ জোসেফও ঐ বর্ণনামত প্রক্রিয়াতে ঐ সৈনিকের নাক তৈরী করেন। ইউরোপে ঐ প্রথম প্লাস্টিক সার্জারী।

ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·50 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র (April-March) গ্রাহক চাঁদা 50·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 30·00 টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।
- 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।
- ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী যে কোন বিজ্ঞান রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।
- পাতার একদিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিটি রচনার সঙ্গেই ছবি পাঠাতে হবে।
- প্রেরিত রচনা এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অনুমোদিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

গ্রন্থসূচী : সায়েন্স ক্যুইজ ● গণিত ক্যুইজ ● নলেজ ক্যুইজ ফিজিক্স ক্যুইজ ● কেমিস্ট্রী ক্যুইজ ● লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

লেখকসূচী : অমরনাথ রায় ● অরূপরতন ভট্টাচার্য ● অলক চক্রবর্তী ● তারকমোহন দাস ও সীমা সেন

ক্যুইজ সেট

প্রকাশিত হয়েছে ৬টি বইয়ের সেট ৫০.

স্টল নং ৫১০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 7TH YR VOL 9

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন	লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	সায়েন্স ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী	ফিজিক্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	গণিত ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	নলেজ ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ । প্রতিটি ১৫ টাকা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২ দাম ঃ 4·00 টাকা।